আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার চতুর্দ্দশ গ্রন্থ

সোনার পদ্ম

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,

শ্রাবণ,—১৩২৬

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
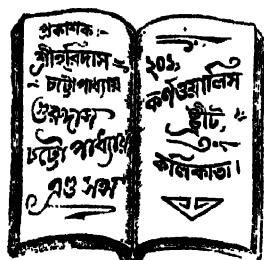
দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে

কয়েকটি কথা

এত শীঘ্র "সোনার পদ্মে"র দ্বিতীয় সংস্করণের আব শ্যক হইবে ভাবি নাই। ইহাতে মনে হয়, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাকে সোনার চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্যও কতকটা সফল হইয়াছে। এরূপ মনে হই বার আরও একটি কারণ আছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, সাবন্তবাদীর মহামান্যা রাণী সাহেবা মহোদয়ার প্রাইভেট সেক্রেটরী মহাশয় আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে,—'রাণী সাহেবা "সোনার পদ্ম" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতা হইয়াছেন, এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইহা মহারাষ্ট্র ভাষায় অনূদিত হয়।' মহামান্যা রাণী সাহেবার এই অপ্রত্যাশিত প্রীতি-প্রকাশে কৃতার্থ হইয়াছি। গ্রন্থখানির অনুবাদের ভার একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে।

আবশ্যক বোধে, বর্ত্তমান সংস্করণে স্থানে স্থানে অল্প পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও সংযোজন করিয়াছি।

শিবপুর,
১৫ই শ্রাবণ, ১৩২৬

গ্রন্থকার

সোনার পদ্ম

১

রামরূপ তর্কালঙ্কার একজন পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত। নিজ বাটীতে তাঁহার একটি টোল ছিল। সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও, তাঁহার বিশেষ কোন অভাব ছিল না। কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্র জমির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার সংসার একরূপ চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে অধ্যাপক-বিদায় হইতেও কিছু কিছু পাইতেন। সংসারটি বড় ছিল না ; তিনি, তাঁহার পত্নী, একমাত্র কন্যা মনোরমা ও এক বর্ষীয়সী ভগিনী, এই কয়জন লইয়াই তাঁহার পরিবার। অতএব তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতেই সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কিন্তু প্রত্যহ ছয় সাতটি ছাত্র তাঁহার বাটীতে আহার করিত ; তিনি তাহাদিগকে অন্নদানের সহিত বিদ্যাদান করিতেন। নিজ পরিবারের কিছু অসুবিধা ও কষ্ট হইলেও তিনি এ কার্য্যকে বিশেষ পুণ্য ও গৌরবজনক মনে করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা

পঞ্চাশ ষাটটি ছাত্রকে প্রত্যহ অন্নদান করিতেন, আর আমি এমনি হতভাগ্য যে, ছয় সাতটি ছাত্রকেও প্রতিপালন করিতে কষ্টবোধ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাটীতে বারব্রত-পূজাদির বাহুল্যই হইয়া থাকে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংসারেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁহার পত্নী পরম ভক্তিমতী ও শুদ্ধশীল রমণী ছিলেন হিন্দুর গৃহে যে সকল আচার নিয়ম অনুষ্ঠিত হইবার বিধান আছে, তিনি যথাসাধ্য সেই সকল পালন করিতেন। উপবাসে তিনি কাতর ছিলেন না। এমন ব্রত ছিল না, যাহার অনুষ্ঠান তিনি করেন নাই। কিন্তু এই ব্রতকর্শিত শরীরকে তিনি এক দণ্ডের জন্যও বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে দিতেন না। প্রত্যূষে গৃহমার্জ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্যই তাঁহাকে নিজে করিতে হইত। বর্ষীয়সী ননন্দার নিকট হইতে তিনি অল্প সাহায্যই প্রাপ্ত হইতেন। ক্রমে যখন মনোরমা বড় হইল, তখন সে গৃহ-কার্য্যে মাতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিল। মনোরমার প্রধান কার্য্য ছিল, পিতার নিত্য পূজাদির সমস্ত আয়োজন করা। ভক্তিমতী বালিকা প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া যখন পুষ্পবাটিকা হইতে পুষ্প চয়ন করিত, তখন শিশির-সিক্ত শুভ্র মল্লিকা-রাশির মধ্যে তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলিগুলির মৃদু সঞ্চালন এক অতি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিত। তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনে হইত, যেন উষারাণী স্বয়ং বালিকাবেশে তর্কা-

লঙ্কার মহাশয়ের সুপরিষ্কৃত, সুশোভিত পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন।

এরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া মনোরমা যে বাল্য-কাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগিণী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মনোরমা সমস্ত বালিকা-ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে। প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করে না। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে মাতার সহিত ইতু-পূজা করে, ও পূজান্তে একাগ্রচিত্তে পিসীমার নিকট "উম্নো ঝুম্নো"র গল্প শ্রবণ করে। এই গল্পটি কোন্ প্রাচীন পল্লীকবির কল্পনা-প্রসূত, জানি না ; কিন্তু ইহাতে দুই ভগিনীর দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র যেরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কবিশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্খ, দরিদ্র, কোপনস্বভাব জনককর্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্তা দুইটি বালিকা দেবতার কৃপায় সৌভাগ্য লাভ করিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠা সৌভাগ্যগর্ব্বে সমস্ত হারাইল, আর ভক্তিমতী, নিরহঙ্কারা কনিষ্ঠা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর আদর্শ-গৃহিণী ও আদর্শ-পত্নী হইয়া রহিয়াছে। পিসীমা যখন সহজ সরল ভাষায় "ঝুম্নো"র চরিত্র-কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তখন বালিকা মনোরমার কোমল হৃদয়ে তাহা এক অপূর্ব্ব ভাবের রেখাপাত করিত।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কন্যার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তবে তাঁহার শিক্ষার প্রণালী

স্বতন্ত্র ছিল। তিনি স্বয়ং তাঁহার কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ও স্বাভাবিক মেধা বলে মনোরমা অতি অল্পবয়সেই রামায়ণ-মহাভারতাদি বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে পারিত। সন্ধ্যার পর সে এই সকল গ্রন্থ তাহার জননী ও পিসীমাতাকে পড়িয়া শুনাইত। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সময় পাইলেই শুনিতে আসিত। এতদ্ভিন্ন তর্কালঙ্কার এরূপ সুকৌশলে অর্থগ্রহসহকারে কন্যাকে নীতি ও ধর্ম্মমূলক সংস্কৃত শ্লোক সকল শিখাইতেন যে, মনোরমা পিতার মুখে শুনিয়া শুনিয়া অল্প অল্প সংস্কৃতও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল স্বাস্থ্য-রক্ষা; সে বিষয়েও সে শিক্ষিতা হইয়াছিল। মনোরমার মাতা সুগৃহিণী ছিলেন। তাঁহাদের সংসারে বিশৃঙ্খলা বা অপব্যয় ছিল না। মনোরমা মাতার নিকট গৃহস্থালীর অনেক কার্য্যও শিখিতে লাগিল।

এইভাবে মনোরমার জীবনের উষাকাল কাটিয়া গেল। সে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় কন্যার বিবাহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পাত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু কোন পাত্রই তাঁহার মনোনীত হইল না। গ্রামের জমিদার হরকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনোরমাকে পুত্রবধূ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কিছুই দিতে পারিবে না, ইহা তিনি জানিতেন, তথাপি মনোরমার ন্যায় একাধারে রূপ-গুণ-সম্পন্না বালিকা দুর্লভ জানিয়া তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া তর্কালঙ্কার-মহাশয়ের

নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তর্কালঙ্কার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহার কারণ, জমিদার-পুত্র মূর্খ ও দুশ্চরিত্র। কুমারখালির যদুনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র বটে; কিন্তু কুমারখালি তর্কালঙ্কারের গ্রাম হইতে অনেক দূর, অনেক নদী খাল পার হইয়া যাইতে হয়। প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যার অত দূরে বিবাহ দিয়া জনক-জননী কিরূপে প্রাণধারণ করিবেন? কাজেই এখানেও হঠাৎ মত দিতে পারিলেন না। এইরূপে অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু একটিও তর্কালঙ্কারের মনের মত হইল না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার টোলের এক অনাথ ছাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিবেন। ছাত্রটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী। কালে সে একজন প্রধান অধ্যাপক হইতে পারিবে। তর্কালঙ্কার যখন অপুত্রক, তখন তাঁহার অবর্ত্তমানে পূর্ব্বপুরুষদিগের টোলটি উঠিয়া যাইবে। কিন্তু অধ্যাপক জামাতা গৃহে থাকিলে, টোলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি ক্রমশঃ একরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংকল্পের কথা আর কেহ জানিল না।

কিন্তু মানুষ যে সকল অভিলাষ করে, তাহাদের কয়টি পূর্ণ হয়? আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে একটির সহিত আর একটি ঘটনা সংলগ্ন করিয়া নিজেদের মনের মত মালা গাঁথিয়া যাই। নির্ম্মম ভবিতব্য, দুরন্ত বালকের মত,

কোথা হইতে চুপি চুপি আসিয়া, তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া পলাইয়া যায়! তাহার তীব্র বিদ্রূপের হাসি আমাদের মর্ম্ম বিদ্ধ করে। ভবিতব্য তর্কালঙ্কার মহাশয়েরও কল্পনাকুসুমের মালা এইরূপে ছিন্ন করিয়া দিল। তাঁহাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে মনোরমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি চিরদিনের জন্য স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

গ্রামে এক নীচজাতীয়া বিধবাকে কে খুন করিল। সেই কার্য্যের সহিত জমিদার মহাশয়ের পুত্রের নাম যোগ করিয়া লোকে নানা কথা বটাইতে লাগিল। মহকুমার ভার-প্রাপ্ত প্রবীণ ডেপুটী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। ঘটনাস্থল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের টোলের অনতি-দূরে। ডেপুটীবাবু সদলবলে টোলের আটচালাতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মনোরমা পিতার জানুদেশে হাত দুইটি রাখিয়া তাঁহার ক্রোড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভর্তৃহরির নীতিশতকের—

"তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং জহি মদং পাপে রতিং মা কৃথাঃ
সত্যং ব্রূহ্যনুযাহি সাধু-পদবীং সেবস্ব বিদ্বজ্জনান্।
মান্যান্মানয় বিদ্বিষোঽপ্যনুনয় প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্
কীর্ত্তিং পালয় দুঃখিতে কুরু দয়ামেতৎ সতাঞ্চেষ্টিতম্॥"—

এই শ্লোকটি পুস্তক হইতে আবৃত্তি করিতেছিল; আর তর্কালঙ্কার মহাশয় কখনও তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে, অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে করিতে, কখনও বা পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে

বুলাইতে তাহার উচ্চারণের দোষ সংশোধন করিয়া দিতে-ছিলেন।

এই দৃশ্যটি দেখিয়া ডেপুটিবাবুর পিনালকোড্‌পিষ্ট নীরস হৃদয়েও অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার হইল। তাঁহার আগমনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাঠনা বন্ধ হইল, মনোরমা তাড়াতাড়ি পিতৃক্রোড় হইতে উঠিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পাহারাওয়ালাদিগের লাল পাগ্‌ড়ির প্রতি চাহিয়া রহিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ডেপুটী বাবুকে আসন দিতে গেলেন। "আপনার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই" বলিয়া নবীনবাবু একজন ছাত্রের মাদুরের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। দারোগাবাবু কিছু দূরে আর একটি মাদুরে বসিলেন, অপর সকলে আশে পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডেপুটীবাবু তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন, "আপনাকে বড়ই বিরক্ত করিলাম দেখিতেছি; কিন্তু কি করি, এমন ফাঁকা পরিষ্কার জায়গা নিকটে আর দেখি-তেছি না। কিয়ৎকাল আপনার অধ্যাপনার ব্যাঘাত হইবে, সে জন্য ক্ষমা করিবেন। উটি কি আপনার কন্যা?"

তর্কালঙ্কার।—আজ্ঞে হাঁ।

ডেপুটীবাবু।—তোমার নাম কি মা?

মনোরমা মাথাটি নীচু করিয়া আরক্তিম মুখে বলিল—"শ্রীমতী মনোরমা দেবী।"

ডেপুটী। মনোরমাই বটে। তর্কালঙ্কার মহাশয়, আপনার কন্যা যখন আপনার ক্রোড়ে শুইয়া পড়িতেছিল, আর আপনি সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সংস্কৃত শ্লোক পড়াইতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, কি যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতেছি। আপনি আবার তেমনি করিয়া বসুন, মা, তুমি আবার তেমনি করিয়া পড় ত।

মনোরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"মা আমার লক্ষ্মী। আমরা ঐ একমাত্র কন্যার মুখ চাহিয়াই বাঁচিয়া আছি।"

"আপনার কি আর কোন সন্তান নাই?"

"আজ্ঞে না।"

তখন আর কোন কথা হইল না। ডেপুটীবাবু মনোরমাকে গৃহে যাইতে বলিয়া খুনের তদারক আরম্ভ করিলেন। জবানবন্দী লেখায় দিস্তা দিস্তা কাগজ শেষ হইয়া গেল। কত লোক আসিল, কত কথা বলিল। কেহ ধমক খাইল, কেহ ডেপুটীবাবুর তীব্র দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, এক বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

তদন্তকার্য্য শেষ হইতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তর্কালঙ্কার মহাশয় ডেপুটীবাবুকে নিজ গৃহে আহার করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু গুরু প্রয়োজন বশতঃ নবীনবাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। যাইবার

সময় তিনি তর্কালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টোলের জন্য কোন বৃত্তি পান কি ?"

তর্কালঙ্কার বলিলেন, "না, আমি বৃত্তির জন্য কখনও আবেদন করি নাই।"

"আমি দুই এক দিনের মধ্যেই আপনার নিকট লোক পাঠাইব, তাহার হস্তে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইবেন। বোধ হয়, আপনার সাহায্যের কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিব। এতগুলি ছাত্রকে বিদ্যাদান ও অন্নদান করিতেছেন, আপনার ন্যায় পণ্ডিত লোককে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। মনোরমা মা'কে একবার অনুগ্রহ করিয়া ডাকিয়া আনুন, যাইবার সময় মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যাই।"

মনোরমা আসিল, লজ্জায় মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া ডেপুটীবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তর্কালঙ্কার বলিলেন—"প্রণাম কর মা!" মনোরমা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। নবীনবাবু সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "মা, আমার বড় সাধ, তোমার ছেলে হই, সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া তোমায় মা বলিয়া ডাকি। তুমি কি আমার মা হইবে মা ?"

আর কোন কথা হইল না। ডেপুটীবাবু পাল্কীতে চড়িয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন।

২

তিন চারি দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে ডেপুটীবাবুর নিকট হইতে একজন আরদালি আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হস্তে একখানি পত্র দিল। মনোরমা সেইমাত্র আসিয়া পিতার পার্শ্বে পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছে। পত্রখানি পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কারের মুখে বিস্ময় ও আনন্দ-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইল। তিনি দুই তিনবার কন্যার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী তখন উঠানে বসিয়া ঠাকুরঘরের বাসনগুলি মাজিতেছিলেন, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভগিনী পৈতা তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ভগিনীকে বলিলেন,—"দিদি, সেদিন যে ডেপুটীবাবু আসিয়াছিলেন, আজ তিনি একজন লোকের হাতে এই পত্রখানি পাঠাইয়াছেন। ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

দিদি বলিলেন,—"তোমার আবার ভাবনা কিসের? তুমি খুনও কর নাই, খুনের কথাও কিছু জান না। আদালতে যেতে হয়, সত্যকথা বলিবে, ধর্ম্মপথে থাকলে ভয় কি?"

তর্কালঙ্কার-গৃহিণী ভীতিব্যঞ্জক নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এ আবার কি বিপদ্!

তর্কালঙ্কার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুনের কথা নয়, দিদি, মনোরমার বিয়ের কথা!"

"মুনীর বিয়ের কথা!"

দুইজন স্ত্রীলোকই আগ্রহের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন—"ডেপুটীবাবু তাঁহার ছোট ছেলের সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ও লোকের হাতে আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন।"

বর্ষীয়সী বসিয়া পড়িলেন, তিনি এত আনন্দ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; তাঁহার চোখে জল আসিল। বলিলেন,—"বুড়ো খুব লোক ভাল, মুনীকে সোনার চক্ষে দেখেছে, আর মুনী ত মেয়ে নয়, যেন লক্ষ্মী সরস্বতী; বুড়ো বউ নিয়ে দেখুক—কি গুণের মেয়ে। তা—ছেলেটি দেখ্‌তে কেমন? কালো বরকে ও মেয়ে দেওয়া হবে না। না, কালো হবে না, বাপ অমন দেখ্‌তে, ছেলে কালো হবে কেন? তবে ছেলে করে কি? ছেলের গুণ থাকা চাই; না হ'লে নবকিশোরের মত পিতলের কাটারিতে কাজ নাই। এবার জব্দ হয়েছেন, খুন ক'রে ম'রেছেন, কবে পুলিস এসে হাত-কড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।"

তর্কালঙ্কার ভগিনীকে বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ কর, দিদি, ও সব কথায় আমাদের কাজ কি? (ঈষৎ হাসিয়া) তুমি, দিদি, চাও যে ছেলের বাপ বড় লোক হবে, আর ছেলেটি বিদ্বান্ ও সুপুরুষ হবে। যে ছেলের এত গুণ, সে আমার মত গরীব লোকের মেয়েকে বে করবে কেন?"

"বে কর্‌বে কেন? আমাদের মুনী যে সাত রাজার ধন।"

"সে আমাদের কাছে, অন্য লোকে তা ভাব্‌বে কেন? কিন্তু তুমি যে রকম চাও, ডেপুটীবাবুর ছেলেটি ঠিক সেই রকমের। ডেপুটীবাবু লিখিয়াছেন, 'আমার পুত্র সুরেশ্বর এম্ এ ও বি এল্ পাশ করিয়াছে, ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হইয়াছে, তাহার বয়স এখনও বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। দেখিতেও সুপুরুষ, আপনার কন্যার অযোগ্য হইবে না। আগামী জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইবে, এজন্য আমাদের ইচ্ছা হয়, এই বৈশাখ মাসের শেষে, না হয় আগামী জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই শুভ কার্য্য শেষ করিব। বোধ হয়, আপনি উভয়ের কোষ্ঠী না মিলাইয়া এ কার্য্যে সম্মত হইবেন না, তাই সুরেশ্বরের কোষ্ঠীও এই সঙ্গে পাঠাইলাম, মিলাইয়া দেখিয়া এই লোক মারফৎ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়, সে দিন যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের দেশ হইতে দিন দিন লুপ্ত হইতেছে, তাহার স্থানে বৈদেশিক আদর্শ একাধিপত্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। অকৃত্রিমতা গিয়া কৃত্রিমতা আসিয়াছে। আমরা দিন দিন বাহিরের চটকেই মজিতেছি। আপনার ন্যায় নিঃস্পৃহ, নিরভিমান, দেবচরিত্র দুই এক জন অধ্যাপকমাত্র এখনও সে প্রাচীন আদর্শকে কতকটা বাঁচাইয়া

রাখিয়াছেন। আপনারা আমাদের ধন্যবাদ ও ভক্তির পাত্র। জীবনের অধিকাংশ সময়ই বৈদেশিক-সংসর্গে মিশিয়া, কেবল বাহ্য উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া, হৃদয় বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আজ জীবনের সন্ধ্যায় অনুতাপ ও অনুশোচনা আসিয়াছে। নিজের গৃহে, বন্ধুবান্ধবের গৃহে, যেখানেই যাই, দেখি, আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর অনুকরণে দুষ্ট, সমস্তই যেন কেমন একটা আন্তরিকতাশূন্য, প্রাণশূন্য। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের ছেলেমেয়েরাও বিকৃতচরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। সে দিন আপনার চতুষ্পাঠীতে খাঁটী দেশী জিনিস দেখিয়াছি, খাঁটী দেশীয় ভাবের শোভায় মুগ্ধ হইয়াছি। মনোরমা যদি আমার বাড়ীর মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহাকে জুতা, বডি, ঘাগ্‌রা ইত্যাদি পরিয়া, কাপড়চোপড়ের পঁচিশ জায়গায় সেফ্‌টি পিন আঁটিয়া, একটা অস্বাভাবিক আড়ষ্টভাবে চেয়ারে বসিয়া কোন বাঙ্গালা নভেল বা ইংরাজী পুস্তক পড়িতে দেখিতাম; মোটা কাপড় পরিয়া, শুধু পায়ে, ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া, পিতার ক্রোড়ে ভর দিয়া, 'তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং' পড়িতে শুনিতাম না। (শ্লোকটি ভুলিয়া গিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দিবেন, ইচ্ছা আছে, পৌত্রীদিগকে শিখাইব)। সংসারে আবার প্রাচীন আদর্শ জাগাইয়া তোলা আমার একান্ত ইচ্ছা। মনোরমার সহিত সুরেশ্বরের বিবাহ দিতে পারিলে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। —এক সব্‌জজের কন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা-

বার্ত্তা হইতেছে। সে দিন আপনার চতুষ্পাঠীতে না গেলে, বোধ হয়, সেইখানেই সম্বন্ধ স্থির করিতাম। এখন আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোষ্ঠি মিলাইয়া দেখা হইয়াছে?"

"হাঁ, মোটামুটি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বিশেষ কোন গোল নাই।"

"এখন তোমার কি ইচ্ছা?"

"কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা গরীব লোক, বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব কি? তাহার উপর ডেপুটীবাবুর পত্র পড়িয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, ছেলেটি বিলাসী ও সাহেবী মেজাজের হইবে; পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইবে? স্বামীর অনাদরে মনোরমাও নিতান্ত অসুখী হইবে, আর মনোরমা যে স্বামীকে সুখী করিবার জন্য আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে অহিন্দু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাও আমার আদৌ সহ্য হইবে না। এ বিবাহের ফল কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, সকলই ভগবানের হাত। তিনি যদি মুনীকে সুখী করেন, তবেই সে সুখী হইতে পারে। পরে কি হইবে, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি? কত ভাল ঘরে যে হ'য়েও মেয়ে অসুখী হ'চ্চে, আর মন্দ বরে প'ড়েও মেয়ে

সুখী হ'চ্চে। সুখী অসুখী করা ভগবানের ইচ্ছা, মানুষের কি হাত আছে? আর বাপের যখন ধর্ম্মে মতি আছে, বাপের যখন হিন্দুর আচার ব্যবহার, তখন ছেলে কি একেবারে বিগ্‌ড়ে যেতে পারে? আমার মনে হয়, ভগবানের ইচ্ছা যে, ডেপুটীবাবুর ছেলের সঙ্গে মুনীর বিয়ে হয়, না হ'লে এ সব যোগাযোগ হবে কেন?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, তোমার কি মত?"

দিদি বলিলেন, "বৌ ঠিক কথাই ব'লেছে। ভগবান্ যখন ডেপুটীবাবুর ছেলের সঙ্গে মুনীর বিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছেন, তখন আমাদের কি তাতে বাধা দিতে আছে?"

মোট কথা, বড়লোকের বাড়ীতে মনোরমার বিবাহের সম্ভাবনায় রমণীদ্বয় অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, মনোরমাকে যে বিবাহ করিবে, সে মনোরমার অনুরক্ত, অনুগত না হইয়া থাকিতে পারিবে না; অতএব স্বামিসুখ মনোরমার নিশ্চিত। সুতরাং এ বিবাহে অমত করিবার প্রয়োজন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ভাবিলেন—

"করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাদ্ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥"

অতএব তিনি বাহিরে আসিয়া হরিস্মরণপূর্ব্বক ডেপুটী-বাবুর প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপক প্রত্যুত্তর লিখিলেন।

৩

নবীনবাবু কলিকাতার অধিবাসী। তবে কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে প্রায়ই মফঃস্বলে থাকিতে হইত। তাঁহার তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেশ্বর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মধ্যম অমরেশ্বর কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল. কনিষ্ঠ সুরেশ্বর সম্প্রতি ডেপুটী হইয়াছে। জামাতা দুইটির মধ্যে প্রথমটি ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয়টি ডাক্তার। দেবেশ্বর ও অমরেশ্বর কলিকাতাতেই বিবাহ করিয়াছেন। বধূদুইটি সহোদরা, ধনিকন্যা ও সুন্দরী। দুই পুত্রের বিবাহে নবীনবাবু যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছেন; এখনও বধূদ্বয় প্রত্যেকে পিতার নিকট হইতে মাসোহারা পাইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠা প্রায়ই স্বামীর সহিত বিদেশে থাকে। সুরেশ্বরের বিবাহে দেবেশ্বর ছুটী লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। নবীন বাবুর এই শেষ কাজ; অতএব তিনি পুত্রের বিবাহে ঘটায় কোন ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু এই বিবাহে নবীন বাবু ভিন্ন আর কাহারও মত ছিল না। গৃহিণী আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, "গরীবের মেয়ে, পাড়াগাঁ, তাদের খ'ড়ো ঘর। কিছু দিতে থুতে পারবে না। যা তত্ত্ব ক'রবে, লোককে দেখাতে পারব না।" সুরেশ

যখন শ্বশুরবাড়ী যাবে, তার ভাল আদর-যত্ন হবে না। সে কি কখনও খ'ড়ো ঘরে খারাপ বিছানায় শুয়েছে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "আমি পাড়াগাঁ, গরীব, খ'ড়ো ঘর দেখেই ত দিচ্ছি। মাসোহারার ঝন্‌ঝনানি শুন্‌তে হবে না; যা উপায় তা সমস্তই বিলাসিতায় খরচ হবে না; বামুন ঠাকুর না এলে, বা তার অসুখ ক'র্‌লে, উপবাস ক'রে বা দোকানের খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হবে না। বাড়ীটা বিলিতি হোটেল হ'য়ে উঠেছে। সকালে উঠেই পাবে চা, বিস্কুট, ডিম। বড় জামাই বাবাজীর হিন্দুর বাড়ীর আহার আর পছন্দ হয় না, তিনি পেলিটির হোটেলে খেয়ে আস্‌তেন, বাপের ভয়ে বাড়ীতে মুসলমান বাবুর্চ্চি রাখ্‌তে পার্‌তেন না। এখন বাপ ম'রেচে, মুসলমান বাবুর্চ্চিও এসেছে। তার দেখাদেখি অমরেশ্বরেরও দেশী খাবারে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। অমি এখনও মরিনি ব'লেই বোধ হয় বাড়ীতে বাবুর্চ্চি আসে নাই। সংসারে তিলমাত্র ধর্ম্মভাব নাই; কেবল বিলাসিতা, আত্মসুখেচ্ছা। ছেলে-মেয়েগুলোও ত দেখ্‌ছ, তারা কি হিন্দুর মেয়ে? দেবেশ্বরের মেজ মেয়েটা বিবিদের অনুকরণে নাকিস্বরে যখন আমায় 'দাঁ দাঁ মঁশাই' বলে ডাকে, তখন আমার হাসিও পায়, দুঃখও হয়। বাপ আবার গৌরব ক'রে বন্ধুদের কাছে বলেন—লিলি,—কি মধুর নাম!—ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা ক'রে, ধরণ-ধারণে হুবহু সাহেবদের মেয়েদের মত

হ'য়েছে। হয় ত কালে সাহেব নাৎজামাই দেখ্‌তে হবে।”

গৃহিণী কতকটা ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, “নিজে আগে কি ছিলে, সেটা বুঝি ভুলে গেছ? মুর্‌গি না হ'লে যে একটি দিন চ'ল্‌ত না, আর এক এক দিন লাল আরক খেয়ে ঘরের মেজেতে যে গড়াগড়ি দিতে! তুমি তখন যেমন ছিলে, এখনও কি তেমনি আছ?”

“না, সে কথা ভুলি নাই; ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই আজ এত অনুতাপ হ'চ্চে। কিন্তু আমার শুধ্‌রাইবার উপায় ছিল, তাই এখন ভাল হইয়াছি। আমি হিন্দুপরিবারে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম; বাড়ীতে প্রত্যহ শালগ্রামের পূজা হইত, নারায়ণের ভোগ না হইলে কেহ খাইতে পাইত না। সমস্ত বারব্রতই বাড়ীতে হইত, মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দরিদ্র, ভিখারীকে পরিতোষের সহিত খাওয়ান হইত। আত্মীয় স্বজনদের আদর যত্ন করা হইত। কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বেশ-বিলাসেই মনপ্রাণ নিয়োজিত হইত না। সংসারের সকল কাজই যেন ঈশ্বরকে লক্ষ্য ক'রে করা হ'ত। সংসর্গদোষে বিলাসী, স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাল্যের সেই উচ্চ আদর্শ কখনও একেবারে ভুলিতে পারি নাই। জীবনের সন্ধ্যায় এখন তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে, আর যাহাতে তাহা না ভুলি, সেই চেষ্টাই করিতেছি। আমি শুধ্‌রাইয়াছি—বাল্যের উচ্চ আদর্শের গুণে। আমাদের ছেলে-

পুত্রেরা কি দেখিয়া শুধ্‌রাইবে? আমরা ত তাহাদের সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শ ধরিতে পারি নাই। তাই অহিন্দু সংসারে হিন্দু-ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিতেছি। দেবেশ্বর ও অমরেশ্বরের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। সুরেশ্বরের এখনও সময় আছে। আমার বংশের অন্ততঃ একজন হিন্দু থাকে, আমরা মরিয়া গেলে যাহাতে অন্ততঃ এক পুত্রের নিকট হইতেও পিণ্ডের আশা করিতে পারি, তাহার উপায় করিতেছি। দোহাই তোমাদের, তোমরা এ বিবাহে বাধা দিও না।"

দেবেশ্বরও এ বিবাহে অসম্মত। তিনি তাঁহার বন্ধু এক সবজজের সুন্দরী কন্যার সহিত সুরেশ্বরের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। সেইখানেই বিবাহ হইত, কিন্তু মধ্যে এই গোল পড়ায় তাহা হইল না। তিনি পিতাকে বলিলেন, "আপনি কি ভাব্‌ছেন—এ বিবাহে সুরেশ্বর সুখী হইবে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "সুরেশ্বরের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ হইলে সুখী হইবে না; নচেৎ তোমাদের সকলের অপেক্ষা তাহারই সুখী হইবার সম্ভাবনা অধিক।"

দেবেশ্বর অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নিরুত্তর হইলেন।

এখন সুরেশ্বরের কথা। সুরেশ্বর ইংরাজী-শিক্ষিত সৌখীন যুবা পুরুষ। তাহার চালচলন সমস্তই ইংরাজী ধরণের। বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তাহার বড় আনন্দ। সে স্থির করিয়াছে—ঈশ্বর, দেবদেবী ধর্ম্ম—ও সব কিছুই নহে। মানবজাতি প্রথম অবস্থায় যখন

অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, সেই সময়েই তাহারা ঐ সকল কুসংস্কারের দাস হইয়া পড়িয়াছিল, পরে কতকগুলা স্বার্থপর লোক নানা কৌশলে তাহাদের সেই সকল কুসংস্কারকে বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে জগতে কতকগুলা গাঁজাখুরী মতের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানের আলোক যতই বৃদ্ধি পাইবে, যতই মানবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে, ততই ঐ সকল অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হইবে। আহারাদি বিষয়ে সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল। প্রায়ই বলিত—বাঙ্গালীর বাড়ীতে যে সকল খাদ্য প্রচলিত আছে, সে সমস্ত একেবারে উঠিয়া গিয়া তাহাদের স্থানে ইংরাজি খাবার প্রচলিত না হইলে বাঙ্গালীর শারীরিক ও মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। কবিদিগের মধ্যে শেলি ও বায়রনই তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। বিবাহ যে একটা পবিত্র সংস্কার, উহা যে নর-নারীর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদান, তাহা সে আদৌ বিশ্বাস করিত না। বলিত—"পরকাল আবার কি, ও ত গুলিখুরী কথা। আর বিবাহ? উহার ভিতর পবিত্রতা বা ধর্ম্মভাবের কি থাকিতে পারে? জীবজগতে যৌন সম্মিলন স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এক পুরুষ বা এক স্ত্রী যে এক নারী বা এক পুরুষে আজীবন আসক্ত থাকিবে, এমন কথা বিজ্ঞানে বলে না, তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য এ বিষয়ে কতকটা বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রগুলা বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে।" সুরেশ্বর বিলাত যাইবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল।

কিন্তু নানা কারণে নবীন বাবুর তাহা অভিপ্রেত না হওয়ায়, এবং ভ্রাতাদিগের নিকট হইতেও আর্থিক সাহায্যলাভের সম্ভাবনা না থাকায়, তাহাকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

সুরেশ্বরের যে এতদূর জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা নবীন বাবু সমস্ত জানিতেন না। সুরেশ্বর এ দিকে যাহাই হউক, পিতাকে বড় ভক্তি ও সম্মান করিত। এই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বিবাহ করিতে সম্মত হইল।

বৌদিদিরা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি এবার তেল-হলুদ আর গোবরের নিন্দা করিতে পারিবে না। পাড়াগাঁ থেকে তিনটে জিনিষই পূর্ণমাত্রায় আস্‌ছে। আহা, এমন দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা কি না তেল-হলুদে নষ্ট হবে!"

সুরেশ্বর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "নষ্ট হ'তে না দিলে নষ্ট হবে কেন? তোমরা বুঝ্‌ছ না, রাঁধুনী বামুন সহজে মেলে না ব'লে বাবা পাড়াগাঁ থেকে একটা রাঁধুনী জোগাড় ক'রে আন্‌ছেন। সে রাঁধবে-বাড়বে, আর হারাণীর মায়ের কাছে শুয়ে থাক্‌বে। আমি একলা যেমন আছি, তেমনই থাক্‌ব।"

"তখন দেখা যাবে! যাই হ'ক, কর্ত্তা কিন্তু কাজটা ভাল ক'র্‌লেন না। একে পাড়াগেঁয়ে, তায় আবার ভট্‌চাজ্জির মেয়ে, হয় ত শুচি-বাই আছে। দাঁতে মিশি দেয় কি না, কে জানে? হয় ত আমাদের দেখে বিবি ব'লে ছোঁবে না।

কেমন ক'রে যে মিলে মিশে ঘরকন্না হবে, তা ত বুঝ্‌তে পারি না।"

"সে তোমরা বুঝে দেখ। আমি ত বে ক'রেই চম্পট দিচ্ছি।"

৪

সুরেশ্বর বিবাহ করিতে গেল। নবীন বাবু বৈবাহিকের অবস্থা বুঝিয়া কোন প্রকার সমারোহ করিলেন না, নিতান্ত আত্মীয় কয়েকজনমাত্র লোক সমভিব্যাহারে পুত্রকে লইয়া সন্ধ্যার কিছু পরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দেবেশ্বর ও অমরেশ্বর আসেন নাই। পাড়াগাঁয়ে আসিবার কষ্ট স্বীকার করিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন না।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরমসমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আপনার দৈন্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে করযোড়ে সকলকে বলিলেন, "গরীবের বাড়ীতে আমি হাতী আনিয়াছি। আপনাদের যোগ্য অভ্যর্থনা করিবার শক্তি আমার নাই। সে জন্য আমার মনে যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। আপনারা কৃপা করিয়া আমার সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

নবীন বাবু বৈবাহিককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, আপনি যদি ওরূপ ভাবে কথা কহেন, তাহা হইলে আপনার সহিত আমার আজ বড়ই ঝগড়া হইবে।

আপনার বাড়ীতে যে আমরা আসিয়াছি, সে আপনার সৌভাগ্য নহে, আমাদেরই সৌভাগ্য।”

তর্কালঙ্কার বরযাত্রীদিগের জলযোগের আয়োজন করিলেন। তিনি যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বরযাত্রীরা পরম পরিতোষ-সহকারে জলযোগ করিলেন। তর্কালঙ্কারের সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নবীন বাবু বলিলেন—“বৈবাহিক মহাশয়, আপনি আমাদের জন্য বিস্তর খরচ ক’রেছেন দেখ্‌ছি। আপনাদের দেশের অমন ভাল রসকরা থাকৃতে এ সব সন্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? যাহ’ক, তত্ত্ব কর্‌বার সময় আর কিছু পাঠাবেন না, কেবল রসকরা পাঠাবেন।”

সুরেশ্বর বরাসনে উপবিষ্ট হইয়া কেবল আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া সে লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিতেছিল। তাহার দুই একজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত, তাহারা কি ভাবিতেছে, মনে মনে কত হাসিতেছে,—এই ভাবনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। বৈবাহিকের সহিত পিতার আত্মীয়তা দেখিয়া সে হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছিল।

একে একে কন্যাযাত্রীরা সভাস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা, কথাবার্ত্তায়, সুরেশ্বর তাঁহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তাহারা প্রথমে কলিকাতার বড় লোকদিগকে দেখিয়া ভয়ে কেহ কোন কথা

কহিতে পারিতেছিল না, পরে দুই এক জন সাহসী পুরুষ মুখ ফুটিয়া দুই একটি কথা বলিতে লাগিল।

পাড়াগেঁয়ে লোক, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্যের কোন ধার ধারে না। তখন বিলাতে মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যদি লিবারেল দল জয়ী হন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য ফিরিবে। সেই আশায় উৎফুল্ল হইয়া লোকে কত দেশহিতকর শাসন-সংস্কারের স্বপ্ন দেখিতেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে সেই সকল বিষয়ে কত দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। কিন্তু এ পাড়াগেঁয়ে লোকগুলা এমনই মূর্খ যে, সে সম্বন্ধে একটি কথাও তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহারা কেবল চাউলের দর, ভাবি ফসলের অবস্থা, পল্লীগ্রামের জলকষ্ট, রাস্তাঘাটের অসুবিধা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অভদ্রোচিত বিষয়ের আলোচনায় সুরেশ্বরের ধৈর্য্যহানি ঘটাইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রামে যে খুন হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে দুই এক জন লোক কথা পাড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নবীন বাবু তাহাতে উৎসাহ না দেওয়ায়, তাহা জলবুদ্বুদের মত একবার উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

একজন সুরসিক—গ্রামসম্পর্কে ঠাকুরদাদা—বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভায়া, আমাদের পল্লীগ্রামের স্থল-কমলিনীকে তোমাদের সহরের মাটীতে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারলে দেখবে, রাজা-মহারাজার নন্দনবনেও কখনও তেমন

ফুল ফোটে না। মনে ক'রেছিলাম, মনোরমা-ফুল ফুট্‌লে নিজেই গলায় ঝুল্‌য়ে রাখ্‌ব ; কিন্তু,—হায়, বিধি পদ্মে কৈল ভেকের আহার !" সকলেই হাসিল ; স্থরেশ্বর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া বরকে বিবাহ-স্থানে লইয়া গেলেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে ভাবে বধ্যমঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়, বরও সেইরূপে চলিতে লাগিল। স্থরেশ্বর ভাবিল, এইবার চিরজীবনের মত তাহার সমস্ত স্থখের সমাধি হইবে।

বর বিবাহস্থলে গিয়া যথারীতি পিঁড়িতে বসিল। উপস্থিত রমণীগণ একবাক্যে বরের রূপের প্রশংসা করিলেন। সকলেই বলিল, বর মেয়ের অযোগ্য হয় নাই। ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, এবার বধূবরের চারি চক্ষুর মিলন। স্থরেশ্বর এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনোরমাকে দেখে নাই। মনের দুঃখে মাথা হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া কলের পুতুলের মত পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি অতি মৃদুস্বরে কতক বলিতেছিল, কতক কেবল শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, চাহিয়া দেখিলে সে নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারিবে না। শুভদৃষ্টির সময় যখন বরকন্যার মাথার উপর কাপড় ঢাকিয়া দেওয়া হইল, নাপিত ছড়া কাটাইতে লাগিল, আর পুরস্ত্রীরা বাহির হইতে বলিতে লাগিলেন, "দু'জনে ভাল করিয়া চাহিয়া দু'জনকে দেখিও, এই

চারি চক্ষুর মিলনেই চিরজীবনের মিলন," তখন, কি জানি কেন. সুরেশ্বরের মনে কি কৌতূহলের উদয় হইল, জানি না—সে চাহিয়া দেখিল। কেবল দেখিল নহে, সুরেশ্বর মুগ্ধ হইল। লজ্জারক্ত মুখী মনোরমা চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র মুখ নামাইল; সুরেশ্বর একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে এত সুন্দর! মনোরমা আর এক-বার কেন চাহিল না! এমন সময় বস্ত্রাচ্ছাদন অপসারিত হইল। পুরন্ধ্রীরা ছাঁদনাতলার অবশিষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সুরেশ্বরের এখন আর সে বিমর্ষভাব নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া একজন ঠানদিদি বলিলেন, "নাত্নীর কটাক্ষের গুণ আছে; এতক্ষণ আমরা সাধ্য-সাধনা করিয়া বরের মুখে হাসি বাহির করিতে পারি নাই; এখন বরের মুখে হাসি ধরে না।"

বাস্তবিকই যে সুরেশ্বর হাসিতেছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার সুন্দর বদনমণ্ডলে এমন একটা উৎফুল্লতা আসিয়াছিল যে, দর্শকদিগের মনে হইতেছিল, যেন তাহার চোখ-মুখ হইতে হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুরেশ্বরের হৃদয় এক অপূর্ব্ব প্রীতির ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

যথারীতি বাসরের আমোদ-আহ্লাদ সমাপ্ত হইল। সুরেশ্বর প্রাণ ভরিয়া আমোদে যোগ দিল। সুরেশ্বর বিবাহ করিতে বসিয়া আচমন করিতে পারে নাই। তাহা লইয়া ঠান্‌দিদিরা খুব

তামাসা জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু সে অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "আপনারা যেমন, ও সব কতকগুলা কুসংস্কার।"

একজন ঠান্‌দিদি মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এবার থেকে বিবি সাজ্‌তে হ'বে দিদি! আর যে রোজ ফুল তুলে ঠাকুর পূজা কর্‌বে, তা' হবে না। শুনেছি নাকি বিবি হ'লে সাহেবদের হাত ধ'রে মাঠে নাচ্‌তে যেতে হয়। মনোরমা পার্‌বি ত?"

মনোরমার মনে বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল, "যিনি দেখিতে দেবতার মত, তাঁহার মন দেবতার মত নয় কেন?"

৫

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে সহরে বড় লোকের বাড়ীতে আসিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল সে নহে, বড়লোকেরাও তাহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মনোরমা এতদিন যে অবস্থায় বাস করিতেছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে দেখিল, তাহার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের লোকদিগের মধ্যে এক বিষম ব্যবধান রহিয়াছে। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির। ইহাদের হৃদয়ের দ্বার যেন তাহার প্রতি রুদ্ধ। তাহার যে যত্নের ত্রুটী হইতেছিল তাহা নহে, কিন্তু সে যত্ন যেন যত্নকারীদিগের হৃদয় হইতে আসিতেছিল না। একজন বৈদেশিক বাড়ীতে আসিলে যেমন

যত্ন করিতে হয়,ইহাও সেই প্রকার যত্ন;আপনার লোককে লোকে যেরূপ যত্ন করে, ইহা সে প্রকার যত্ন নহে। এ যত্নের মধ্যে যেন একটা কৃত্রিমতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়।

মনোরমা যে দিন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া সে দেখিল,বাড়ীর দুই একজন দাসদাসী ভিন্ন তখনও কেহ উঠে নাই। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্পবাটিকা হইতে দেবপূজার জন্য পুষ্প চয়ন করা তাহার অভ্যাস। পুষ্পগন্ধামোদিত প্রাতঃসমীরণ সেবনে তাহার মন প্রাণ প্রফুল্ল হইত। এখানে সে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তাহার মন বিষণ্ণ হইল। সে ভাবিল, ইহাদের বাড়ীতে কি পূজা হয় না? যদি হয়, তবে ফুলের বাগান নাই কেন? সে চুপ করিয়া দালানের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে একে একে বাড়ীর সকলে জাগিয়া উঠিলেন। বড় বৌঠাকুরাণী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছোট বউ, তুমি ভাই এত সকালে উঠিয়াছ? তা একলা অমন চুপটি করে ব'সে আছ কেন? আমার সঙ্গে এস।" মনোরমা উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সহিত বাহিরে গেল।

মনোরমা আপনার শয়নকক্ষের বাতায়নে বসিয়া খড়খড়ির ছিদ্র দিয়া সহরের রাস্তার জনতা দেখিতেছে। এত লোক যাইতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না,

সকলেই আপন আপন কাজে চলিয়াছে। মনোরমা ভাবিল— সহরের লোক কি হৃদয়হীন! এমন সময়ে দেবেশ্বরের কনিষ্ঠা কন্যা ভিক্টোরিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিল, "ছোট কাকীমা, মা ডাকছেন, চা খাবে এস।"

মনোরমা বলিল, "আমি চা খাই না।"

বালিকা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"চা খাও না কাকিমা। চা না খেয়ে থাক কি করে?"

মনোরমা কোন উত্তর করিল না; কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নহে, বলিল, "মা ব'লেছেন যে, যদি চা না খাও, তবে কিছু খাবার খাবে এস।"

মনোরমা উত্তর করিল, "এত সকালে খাওয়া ত আমার অভ্যাস নাই। এখনও আমার শিবপূজা হয় নাই।"

"তুমি বল কি কাকিমা! সকালে কিছু খাবে না? শিব-পূজা আবার কি কাকিমা? আমাদের বাড়ীতে ত কেউ শিব-পূজা করে না! আর আমরা ত সকলেই সকালে উঠে চা ও খাবার খাই। যে দিন বাবুদের হ'য়ে বাঁচে, সে দিন চাকর ডিম এনে দে যায়, তাও খাই। ছোট কাকা-বাবুও খান। আমাদের নূতন বেহারা খুব ভাল ডিম রাঁধে।"

মনোরমা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "আমি ওসব খাই না।"

বালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,

"তোমাদের পাড়াগাঁয়ে বুঝি ওসব খায় না, কাকিমা? না, তোমরা গরীব ব'লে খাওনা কাকিমা?"

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "হাঁ মা আমরা পাড়াগেঁয়েও বটে, গরীবও বটে, তাই খাই না।"

"তবু তুমি আমার সঙ্গে এস।" বলিয়া বালিকা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে অন্তঃপুরিকারা চা খাইতেছিলেন, সেইখানে লইয়া গেল।

মনোরমা আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল, চা ও খাবারের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সকলে ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছেন, আর চায়ের পেয়ালা, কেটলি, সসার, চামচে, চিনি, দুধ, বিস্কুট ইত্যাদি এরূপভাবে সাজান রহিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় ঘরটি একটি ছোট খাট হোটেল।

মনোরমাকে দেখিয়া বড় বউ বলিলেন, "এস ভাই, এস, তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রছি।"

মনোরমা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, ভিক্টোরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "মা, ছোট কাকিমা চা খাবে না। বলে ওরা পাড়াগেঁয়ে গরীব লোক, চা খায় না, আর শিবপূজা না ক'রে খাবার খায় না।"

বড় বধূ কন্যাকে ধমকাইয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউ, তুমি কি চা খাও না?"

মনোরমা বলিল, "না।"

"তবে তোমার খেয়ে কাজ নাই।" পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু ভাই,

পʼড়েছ হারামের হাতে।
খানা খেতে হʼবে সাথে॥

ছোট ঠাকুরপো চা-খোর, আরও কত-কি-খোর, তা' পরে জান্‌তে পার্‌বে। তুমি যদি এসব না খাও বা ঘৃণা কর, তবে দুজনে মিলে মিশে থাক্‌বে কি কʼরে? আমরা ত এতে কোন দোষ দেখি না, তা ভাই, তোমার বাপ ভট্‌চাজ্জি, তিনি তোমাকে কি শিখ্‌য়েছেন বʼল্‌তে পারি না।"

ননান্দা ব্যারিষ্টার-গৃহিণী মনোরমার এই সকল আচার বিচারে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, এবং কতকটা সমাজের ভয়েও, নবীনবাবু তাঁহাদের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহার একরূপ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সংসার হইতে এই অনাচার দূর করিবার জন্যই তিনি পাড়াগেঁয়ে ভট্‌চাজ্জির মেয়ে বউ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন। তাই ননান্দা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"তুমি আমাদের ছুঁয়ো না ভাই? আমাদের কি জাত আছে?"

সকলে হাসিল। এমন সময় ডাক্তার-গৃহিণী আসিলেন। দিদি বলিলেন—"কি করিস্ কমল? ছোট বউকে ছুঁয়ে ফেল্লি। তুই যে খৃষ্টান। তোর স্বামী যে মড়া ঘাঁটে।"

কমল সমস্ত শুনিয়া বলিল—"ও কথা ছেড়ে দাও দিদি;

ওর যদি খেতে রুচি না হয় নাই বা খেলে। দিন কতক যা'ক তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কমল মনোরমার পার্শ্বে বসিয়া চা খাইতে লাগিল।

মনোরমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না। সে অমরেশ্বরের একটি পুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া তাহাদের খাওয়া দেখিতে লাগিল, ও একটি সন্দেশ ভাঙ্গিয়া বালকের মুখে একটু দিতে গেল। মেজ বউ বলিয়া উঠিলেন—"কি কর ছোট বউ! খোকাকে সন্দেশ দিও না, ওর অসুখ, দু' চামচ হর্লিক্‌স্ মিল্ক ও ওর সহ্য হয় না।"

কিছুক্ষণ পরে বেহারা একটি কাচের পাত্রে করিয়া কয়েকটি ডিম আনিয়া দিয়া গেল। বড় বৌ ও মেজ বৌ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন, একবার মনোরমার দিকে চাহিলেন, পরে বালক-বালিকাদিগকে বলিলেন, "ওগুলো তোরা খেয়ে ফেল্।"

লিলি বলিল, "তোমরা খাবে না?"

বড় বউ ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—"না।"

প্রাতর্ভোজন-সমাপনান্তে বড় বউ ও মেজ বউ স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বড় বউ ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, মেজ বউ চিঠি লিখিতে বসিলেন। মনোরমা দেখিল, তাঁহারা ভাল করিয়া হাত মুখও ধুইলেন না, কিংবা যে স্থানে আহারকার্য্য সম্পন্ন হইল, সে স্থান গোময়

দ্বারা ধৌত করাও হইল না। তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, "এ কি খ্রীষ্টানের বাড়ী!"

এমন সময় গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন, "এস মা, তোমার শ্বশুর তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

মনোরমা ঘোম্‌টা দিয়া শাশুড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নবীন বাবু তামাকু সেবন করিতেছিলেন। মনোরমাকে দেখিয়া গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া ডাকিলেন, "এস আমার লক্ষ্মী মা এস। ঘোম্‌টা দিয়ে অত দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত হবে না মা! আমার কাছে এস।"

শাশুড়ী বলিলেন, "যাও মা, কাছে যাও। তোমার শ্বশুরের বড় ইচ্ছা, তুমি যেমন তোমার বাপের কোলে শুয়ে শ্লোক প'ড়তে, তেম্‌নি ওর কোলে শুয়ে শ্লোক প'ড়বে।"

মনোরমা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। নবীন বাবু উঠিয়া আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মা, তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

মনোরমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না"।

তোমার সামান্য কোন কষ্ট বা অসুবিধা হ'লে তোমার শাশুড়ীকে বা আমাকে ব'ল্‌বে, কোন লজ্জা ক'রো না। তা ক'র্‌লে কিন্তু আমার বড় কষ্ট হবে, আমি বুঝ্‌ব তুমি আমাকে ছেলের মত ভালবাস না। মা, একবার সেই সে দিনকার

শ্লোকটা বল ত,—"তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং জহি মদং পাপে রতিং মা কৃথাঃ—"

মনোরমা ধীরে ধীরে সুন্দর ভাবে শ্লোকটি আবৃত্তি করিল। নবীন বাবু বলিলেন—"দেখেছ, গিন্নি, আমি বাড়ীতে একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী এনেছি।"

এমন সময় ভিক্টোরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া খবর দিল, "দাদামশাই, ছোট কাকীমা চা খান নাই। বলেন, শিবপূজা না ক'রে তিনি কিছু খাবেন না।" বলিয়া বালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দাদামশাই তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "ঠিক কথাই ত! শিবপূজা না ক'রে কি হিন্দুর মেয়ের জল খেতে আছে? গিন্নি, তুমি এখনই ছোট বউমার পূজার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দাও।"

ভিক্টোরিয়া বলিল, "দাদা মশাই, আমরা ত শিবপূজা না ক'রে খাই।"

"ভাল কাজ কর না। আজ থেকে ছোট কাকীমার কাছে পূজা শেখ। শিবের স্তব কেমন সুন্দর শুন্‌বি? মা, একবার শিবের স্তবটি বল ত।"

মনোরমার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে, ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে, সুস্পষ্ট ভাবে, হ্রস্ব দীর্ঘ যতি মাত্রা বজায় রাখিয়া সে ব্যাস-বিরচিত শিবাষ্টক স্তোত্র পাঠ করিল।

নবীনবাবু মুদিত নেত্রে তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

পরে ভিক্টোরিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেমন শুন্‌লি ?"

সে বলিল—"এর চেয়ে দিদি হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেশ ভাল গান কর্‌তে পারে। তুমি ত তার—'এস হে, বঁধু হে, সখা হে, প্রিয় হে' গান শোন নি ? বল্‌ব দিদিকে সেই গানটা গাইতে ?"

নবীনবাবু বিরক্তিসহকারে মুখ ফিরাইলেন।

গৃহিণী মনোরমাকে বলিলেন—"এস মা, তোমার পূজার বন্দোবস্ত ক'রে দিই গে।"

৬

ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীলোকেরা যথারীতি নবদম্পতির সহিত কৌতুক ও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একে একে চলিয়া গেল। সুরেশ্বরের শয়নকক্ষে সুরেশ্বর ও মনোরমা ভিন্ন আর কেহ রহিল না। সুরেশ্বর এ পর্য্যন্ত মনোরমাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। আজ সেই অবসর আসিয়াছে। সে প্রাণ ভরিয়া মনোরমাকে দেখিল, তাহার মনে হইল পৃথিবীতে এত সুন্দর সে আর কিছু দেখে নাই। তখন বৌদিদিদের উপহাসের কথা তাহার মনে হইল। সে আদর করিয়া মনোরমার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "দেখ, বৌদিদিরা ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিলেন, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে তেলহলুদে বিছানা নষ্ট ক'র্‌বে। আমিও ভেবেছিলাম, না জানি তুমি কত তেলহলুদ মেখে হাজির হ'বে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি ওঁরা সাবান মেখে

যতটা পরিষ্কার, তুমি সাবান না মেখেও ওঁদের চেয়ে অধিক পরিষ্কার—অধিক সুন্দর।" মনোরমার মুখমণ্ডলে যেন কত গোলাপ ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বর উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল—"বলিতে কি, আমি প্রথমে বাবার উপর বড় চটিয়াছিলাম. কোথাকার একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রলেন। যতক্ষণ না চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে কি মনের কষ্টই ভোগ ক'রেছিলাম তা কি ব'লব! কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে আত্মসমর্পণ ক'রেছি, বলেছি তুমি বরণীয়। তুমি লেখাপড়া জান শুনেছি, কি প'ড়েছ ?"

মনোরমা মৃদুস্বরে বলিল, "একটু বাঙ্গালা জানি।"

"কি কি বই প'ড়েছ ?"

"রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, মেঘনাদবধ, স্বাস্থ্যরক্ষা।"—

"বঙ্কিমবাবুর নভেল পড় নাই ?"

"না।"

"বাবা বলিতেছিলেন, তুমি সংস্কৃতও জান।"

"দু' একটি সংস্কৃত শ্লোক জানি।"

"তারই একটা বুঝি একদিন তোমার বাপের কোলে শুয়ে প'ড়ছিলে, আর বাবা খুনের তদারকে গিয়ে তাই শুনেছিলেন ?"

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ, মনোরমা, এবার হইতে আমি তোমাকে ইংরাজী শিখাইব। আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছি। সাহেবসুবোদের সঙ্গে মেশামিশি না ক'র্লে শীঘ্র উন্নতির আশা নাই। দেখ্‌বে তোমাকে আমি কেমন শিক্ষিত ক'রে তুল্‌তে পারি।"

মনোরমা মৃদু অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আমি তা' পারব না।"

"কি পারবে না? ইংরাজী শিখিতে?"

"দরকার হয় ইংরাজী শিখিতে পারি, কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা ক'র্‌তে পারবো না।"

"কেন, বড় বউদিদি ত করেন। সে জন্য সাহেবমহলে দাদার মানসম্ভ্রম কত! তাঁর মেয়েরা পর্য্যন্ত সুন্দর ইংরাজী বল্‌তে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক-গাড়ী ক'রে বেড়াতে যায়।"

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

সুরেশ্বর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে পরের কথা। এখন তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। শুনিলাম তুমি চা, ডিম প্রভৃতি খাও না, পূজা না ক'রে জল খাও না। এ কি সত্য কথা?"

"হাঁ।"

"কিন্তু আমি ত খাই। আমি পূজার বিরোধী, আমি ঈশ্বর মানি না, ঠাকুরদেবতা মানি না, কারণ ও সকল মিথ্যা

বাজে কথা। তা হ'লে আমার উপর ত তোমার ভক্তি ভালবাসা হ'বে না।"

মনোরমা আর সহ্য করিতে পারিল না। সুরেশ্বরের হাতে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিল, "কাঁদিতেছ কেন? কাঁদিবার কথা ইহাতে কি আছে?"

মনোরমা মাথা তুলিল, বলিল, "যে সময় হইতে আমার জ্ঞান হইয়াছে, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি ঈশ্বরকে, ঠাকুরদেবতাকে ভক্তি করিতে ও পূজা করিতে শিখিয়াছি। বাবা বলিয়াছেন, ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করাই মানুষের কর্ত্তব্য। সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট, নানা প্রলোভন মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কেবল ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি থাকিলেই মানুষ সেই সকল দুঃখ কষ্ট, প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে। দেবপূজা করিলে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হয়। তাহা না করিতে পারিলে আমি সুখী হইতে পারিব না।" মনোরমা প্রাণের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল; বলিয়াই যেন কতকটা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল।

"কিন্তু তাহা করিলে আমি ত সুখী হইব না। আমি যাহা অসত্য বলিয়া জানি, আমার স্ত্রীকে সে অসত্যের অনুসরণ করিতে দিতে পারি না। যদি সে তাহা করে, তাহা

হইলে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে করিবে। তোমার বাপ সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত”—

মনোরমা ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিল,“আমার বাপ একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।”

সুরেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,“তা হইতে পারে,কিন্তু তিনি ইংরাজী জানেন না, বিজ্ঞানের ধার ধারেন না। ইংরাজী না জানিলে, সদসৎ, সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন। উঁহারা সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আবহমান কাল যে রীতি চলিয়া আসিতেছে, সেই রীতিরই পক্ষপাতী; তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সময়ের উপযোগী কি অনুপযোগী, তাহা বুঝিয়া দেখেন না, বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই। কিন্তু সে কথা এখন যাক্। তোমাকে বলিতেছি, মনোরমা,”—সুরেশ্বর এরূপ গম্ভীর ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কথাগুলি বলিতে লাগিল যে, মনোরমার প্রাণের ভিতর একটা গভীর ভয়ের সঞ্চার হইল—“আমরা এইমাত্র সংসারে প্রবেশ করিতেছি। এ সময় হইতে আমাদের পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা ভাল; কেন না, এখন যাহা বুঝিব, সেই অনুসারে দুইজনের ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠিত হইবে। যদি ঐ সকল কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলা তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তাহা করিতে পার, আমি তাহাতে বাধা দিব না; কিন্তু এটা মনে রাখিও, তাহা হইলে তুমি আমাকে পাইবে না, আমার হৃদয়-দ্বার চিরকালের জন্য তোমার প্রতি রুদ্ধ থাকিবে। আমি পূর্ব্বে আমাদের দেশে

প্রচলিত বিবাহ-প্রথার বিরোধী ছিলাম, এই কয় দিনে আমার সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু যে স্বামী-স্ত্রী সকল বিষযে পরস্পরের অনুরূপ নহে, তাহাদের বিবাহকে আমি বিবাহ বলি না। বিলাতের এক জন বড় কবি বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মনের মিল না হইলে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। এখন বল তুমি কি চাও? দু'জনে একমন, একপ্রাণ হইয়া, আদর্শ-দম্পতিরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিব, কিংবা দু'জনের হৃদয়ের মধ্যে আজীবন এক বিরাট্ প্রাচীর তুলিয়া সংসারে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিব? ভাবিয়া উত্তর দাও।"

মনোরমা স্বামীর বাহুমূলে মাথা রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল। বিবাহের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে পিতা তাহাকে শিখাইয়াছিলেন—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

এই কথাই এখন তাহার মনে হইতে লাগিল।

সুরেশ্বর কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল, মনোরমা?"

মনোরমা অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি কখনও তোমার অবাধ্য হইব না। আমাকে যেমন শিখাইবে, তেমনই শিখিব।"

সুরেশ্বর সস্নেহে পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। মনোরমা স্বামীর আদরে গলিয়া গেল।

৭

কয়েক দিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া মনোরমা পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাড়ার প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তর্কালঙ্কারেব গৃহ পূর্ণ করিল। মনোরমা তাহাদের প্রশ্নের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, যা, ননদ, সকলের পরিচয় দিতে দিতে, ইঁহারা প্রত্যেকে তাহার কিরূপ আদর ও যত্ন করিয়াছেন, তাহা বলিতে বলিতে, মনোরমার মুখে ব্যথা ধরিয়া গেল। ঠান্‌দিদিরা স্বামীর আদর সোহাগের কথা পাড়িলেন, মনোরমা তাহার কোন উত্তর দিল না, তবে তাহার ব্রীড়াজনিত ঈষৎ-হাস্যরেখায় অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু ঠান্‌দিদিদের হাত এড়াইয়া যখন সে নিভৃতে সমবয়সীদের হাতে পড়িল, তখন তাহাকে অনেক কথাই বলিতে হইল। মোট কথা, সকলেই জানিল যে, মনোবমা সুখী হইয়াছে। সকলেই তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। একজন পুরস্ত্রী বলিলেন, "মনোরমার শিবপূজা সার্থক হইয়াছে।"

মনোরমার শ্বশুরালয়ের অহিন্দু আচার ব্যবহারের কথা প্রথমে মাতা জানিলেন, পরে তর্কালঙ্কার মহাশয় শুনিলেন। মনোরমা যে ইচ্ছা করিয়া এ সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা নহে। কারণ, সে জানিত এ কথায় তাহার মাতাপিতা বিশেষ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু দৈবক্রমে এ কথা মাতা বিদিত হইলেন।

স্বামীর নিষেধ সত্বেও মনোরমা শিবপূজা ছাড়ে নাই। সে পূর্ব্বে যেমন প্রত্যহ পিতার পূজার আয়োজন করিত, সেই-রূপই করিতে লাগিল; প্রত্যহ নিজে যেমন শিবপূজা করিত, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিল। কিন্তু পূজায় আর তাহার শান্তি নাই। সে ভাবিত, পূজা করায় স্বামীর ত অবাধ্য হইতেছি, স্বামীর নিকট মিথ্যাবাদিনী হইতেছি। স্বামীর অবাধ্য হইলে কি দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন? কারণ, তাহার মাতা-পিতাই যে শিখাইয়াছেন, স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। মনোরমা এ কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। আবার পূজা না করিলে যে, তাহার প্রাণে শান্তি হয় না! একদিন অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে মনোরমা শিবের নিকট জানাইল যে, সে আর এ সংশয়ের অবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছে না; ভগবান্ তাহার মনে শান্তি দিন ও তাহার কি করা উচিত বলিয়া দিন। মনোরমার মাতা এই সময় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সকল কথা ব্যক্ত হইল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি ব'লব মা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কর্ত্তাও ঐ আশঙ্কা ক'রেছিলেন। তোমাকে স্বামীর ঘরই চিরকাল ক'রতে হ'বে—ভগবান্ করুন সেই ঘরই যেন তোমায় চিরকাল ক'রতে হয়। তোমার শ্বশুরের কথা যে টিক্‌বে, তা ত মনে হয় না; কেন না সুরেশ্বর চিরকালই বিদেশে বিদেশে ঘুর্‌বে, তোমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকৃতে হবে। তার কথামত কাজ না ক'র্‌লে তোমাদের

মনের মিল হবে না, কাজেই তোমরা সুখীও হবে না। সকলই নারায়ণের হাত, তিনি যা ক'র্‌বেন তাই হবে।"

পিতাও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই কথাই বলিলেন, "সকলই নারায়ণের হাত।"

সেই দিন রাত্রে মনোরমা স্বপ্ন দেখিল, - স্বয়ং হরগৌরী বৃষভবাহনে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত। মহাদেব বলিলেন, "মনোরমা, তুমি আজ আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলে, স্বামীর কথা শুনিবে কিংবা আমার পূজা করিবে। আমি ভগবতীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তোমাকে উত্তর দিতে আসিয়াছেন।" ভগবতী বলিলেন, "মনোরমা, স্বামিসেবাই স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম, তুমি কখনও স্বামীর অবাধ্য হইওনা।" মনোরমা সশরীরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে গেল। তাঁহারা তখন শূন্যে অনেক উপরে উঠিয়াছেন। মনোরমা করযোড়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "মা, আমার স্বামীর মতিগতি কি ফিরিবে না?" ভগবতী সস্নেহে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ফিরিবে, দু'জনে সোনার পদ্মে আমাদের পূজা করিও।"

মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে জাগিয়া দেখিল, পিসিমা তাহাকে ঠেলিতেছেন আর বলিতেছেন, "মুনী, তুই চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?" মনোরমা তখন কাঁপিতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিতেছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "স্বপ্ন দেখেছি, পিসিমা।"

পরদিন মাতাপিতা উভয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। দু'জনেই বলিলেন, "তাঁহার ইচ্ছা!"

মনোরমা অধিক দিন পিত্রালয়ে থাকিতে পাইল না। বিবাহের কিছুকাল পরেই সে শ্বশুরালয়ে গেল—কলিকাতায় নহে, শ্বশুরের মফস্বলের বাসায়।

ইহার কয়েক মাস পরে নবীনবাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি কাশীতে একখানি বাটী ক্রয় করিয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করিলেন। মনোরমা স্বামীর নিকট গেল।

৮

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সুরেশ্বর একজন নামজাদা ডেপুটি হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি এক মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুরেশ্বরের ন্যায় সুখী কে? নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বিদ্যা, অর্থ, পরোপকারিতা প্রভৃতি যে সকল থাকিলে মানুষ সংসারে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়, সুরেশ্বরের সে সমস্তই ছিল। সর্ব্বোপরি সুরেশ্বর পত্নীরূপে এক রমণীরত্ন লাভ করিয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সুরেশ্বর দেখিতে পাইল, মনোরমার বাহির যত সুন্দর, ভিতর তদপেক্ষা আরও সুন্দর। পত্যেকদেবতা মনোরমার সেবায়, আদরে, প্রেমে সুরেশ্বর বিভোর। এমন

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুরেশ্বর আর কোথাও দেখে নাই। কর্ম্মজীবনের, সংসারের অনেক জটিল বিষয়ের সমাধানে মনোরমা স্বামীর প্রধান অবলম্বন ছিল। এক কথায় মনোরমা সুরেশ্বরের

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

এমন স্ত্রীর ভাগ্যবান্ স্বামী কি কখনও অসুখী হইতে পারে ?

বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে বিবাহ সম্বন্ধে সুরেশ্বরের বৈজ্ঞানিক মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক সুরেশ্বর এখন আর বিবাহকে কেবল যৌন সম্মিলন বলে না; বিবাহের যে এক গভীর, মহান্, পবিত্র উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বীকার করে। পরজন্ম, পরকালেও তাহার যেন কতকটা বিশ্বাস হইয়াছে; কারণ, সে ভাবিতে পারে না যে, তাহার ও মনোরমার মিলন এই জন্মেই শেষ হইবে; দুইটি পথিকের মত তাহারা দুই দিনের জন্য সংসার-পান্থশালায় মিলিত হইয়াছে, তাহার পর কে কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। এরূপ ভাবিতে তাহার প্রাণে বড় কষ্ট হইত। তাই সে ভাবিত, আমাদের জ্ঞান কোন অজ্ঞেয় কারণে সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা প্রকৃতির সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন এক জীবনব্যাপি নহে।

তাহার পর যে দিন মনোরমা স্বামীকে ত্রিদিবচ্যুত চন্দ্র-কলার ন্যায় একটি পুত্রসন্তান উপহার দিল, সেদিন সুরেশ্বরের

নিকট বিবাহের আর একটি গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। কি এক মধুময় আকর্ষণ তাহার হৃদয়কে যেন কোন্ অনন্ত প্রেম-পারাবারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! বিজ্ঞানের লূতাতন্তুর বন্ধন সে আকর্ষণের বেগে যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। সুরেশ্বর ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কারণ. তাহার মনোরমা, তাহার নবকুমার, যে অনন্ত প্রেমক্ষীরোদের দুইটী ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র, সুরেশ্বর এখনও সে ক্ষীরোদসমুদ্রের সন্ধান পায় নাই।

আর মনোরমা? প্রভাতের ঈষদুন্মিন্ন কমল-কলিকা এখন পূর্ণবিকসিত পদ্ম। কিন্তু আমাদের সে মনোরমা কোথায়? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কন্যা, পূজাজপ-পরায়ণা, বিলাস-সংস্পর্শ-শূন্যা, হিন্দুকন্যা মনোরমা কোথায়? ডেপুটি-গৃহিণী মনোরমা গাউন পরে, সময়ে সময়ে জুতা পরে, চা খায়, ডিম খায়; পেঁয়াজ রশুনের গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করে না; মুসলমান বাবুর্চ্চির প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তা না হউক, কিন্তু তাহার একটি পরিবর্ত্তনে আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। মনোরমা বারব্রত ভুলিয়াছে, শিবপূজা ভুলিয়াছে। সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বামিসেবায় অর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছে। মনোরমা দেবতা ভুলিয়াছে বলিলে ঠিক বলা হইবে না; সে দেবতার আদেশে কিছুদিনের জন্য দেবতাকে ভুলিয়াছে। কারণ তাহার আশা আছে, স্বামী ফিরিবেন। মনোরমা সেই দিনের প্রতীক্ষায়, স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া ভগবান্-ভগবতীর পাদপদ্মে অঞ্জলি

দিবার জন্য, গোপনে একটি স্বর্ণপদ্ম প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সে একবারও স্বামীর নিকট ভগবানের কথা তুলে না। কারণ, পূর্ব্বে যখনই ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, স্বামী তীব্র বিদ্রূপে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন। দেবতার প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিত, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় পতিব্রতা অস্থির হইয়া উঠিত; তাই সে স্বয়ং ভগবৎ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দূরে থাকুক, বরং সে সম্ভাবনা দেখিলে তাহা যত্ন সহকারে দূর করিবার চেষ্টা করিত।

এইরূপে দিন যায়। সুরেশ্বরের নিজের সুখের সংসার সমগ্র পৃথিবীকে তাহার নিকট সুখময়ী করিয়া তুলিয়াছে। পিনালকোডের মোকদ্দমা করিতে করিতে সুরেশ্বর ভাবিত, আহা এমন সুখের সংসারে লোকে অসুখ, অশান্তি আনে কেন? পত্নীর স্নেহ-সম্ভাষণ, পুত্রের মধুর কাকলী সমস্ত দিন তাহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইত। দিবাশেষে কর্ম্মক্লান্তদেহে যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন জননীর ক্রোড় হইতে পিতৃ-ক্রোড়গমনাভিলাষী প্রসারিতবাহু বালকের হাস্যমধুর মুখখানি চন্দনলেপের ন্যায় তাহার সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ ও সতেজ করিয়া তুলিত। সুরেশ্বর এক একদিন এমন অসাবধান হইয়া পড়িত যে ভাবিত, এই বুঝি স্বর্গ!

একদিন সুরেশ্বর এজলাসে বসিয়া বিচার করিতেছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "খোকার বড় অসুখ, মা এখনই ডেকেছেন।"

সুরেশ্বরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে বুঝিল ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর, নচেৎ মনোরমা কখনও তাহাকে এরূপ সময়ে সংবাদ পাঠাইত না। তখনই কাছারি বন্ধ করিয়া সুরেশ্বর বাসার দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল, খোকার বিষম বিসূচিকা হইয়াছে, চিকিৎসক উপস্থিত, মনোরমা পাগলিনীর ন্যায় খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। বালার্করঞ্জিত ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গের ন্যায় চিরচঞ্চল, চিরহাস্যময় সে শিশু কোথায়? শিশু দারুণ পিপাসায় মধ্যে মধ্যে নবকিসলয়-সদৃশ ওষ্ঠপুট উদ্ভিন্ন করিতেছে, দাসী বিন্দুবিন্দু জলে তাহার ওষ্ঠাধর সিক্ত করিতেছে। জননী অন্তর্বাষ্প কাদম্বিনীর ন্যায় স্থিরভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

সুরেশ্বর পাগলের মত জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু! কিছু কি উপায় নাই?"

পিতার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া শিশু একবার সে দিকে ফিরিবার চেষ্টা করিল। সুরেশ্বর তাহা দেখিয়া ছুটিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইতে গেল। বালকের অন্তস্তাপশুষ্ক ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসি মিলাইতে না মিলাইতে শিশুর ক্ষুদ্র জীবন অনন্তে মিলাইয়া গেল। সুরেশ্বর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মনোরমা নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশ্বর শয্যাত্যাগ করিয়া মনো-

রমাকে দেখিতে পাইল না। পূর্ব্বদিন মনোরমার যে গম্ভীর ভাব দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার মনে আশঙ্কার সঞ্চার হইল। শোক রুদ্ধবেগ হইলে অনেক অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। সুরেশ্বর উন্মাদের ন্যায় প্রতিগৃহে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার খোকার দোলার কাছে গেল। সে দোলায় যে শতদলপদ্ম প্রস্ফুটিত থাকিত, তাহা নাই। সুরেশ্বর তীরবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপরে নীচে ছুটিতে লাগিল। দাসদাসী কেহই মনোরমার সন্ধান বলিতে পারিল না। সুরেশ্বর চীৎকার করিয়া ডাকিল—মনোরমা! কোন উত্তর নাই। এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল, "মাঠাকুরাণী ছাদের উপর বসিয়া আছেন।" সুরেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া ছাদে উঠিল, দেখিল—মনোরমা যুক্তকরে উদীয়মান নব-ভাস্করের প্রতি চাহিয়া আছে। সুরেশ্বর ডাকিল—মনোরমা!

মনোরমা সূর্য্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"প্রণাম কর। ভগবান্-ভগবতী আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন।"

সুরেশ্বর কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"প্রণাম করিব, কিন্তু ভগবান্ আমার খোকাকে ফিরাইয়া দিবেন কি? আমার যেটি ছিল, যেমনটি ছিল, সেইটি তেমনি ভাবে আবার কি আমি দেখিতে পাইব? বিজ্ঞান বলে আমার সেটি আর ফিরাইয়া পাইব না।"

সুরেশ্বরের চক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

মনোরমা উঠিয়া আসিয়া স্বামীর হাত ধরিল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"পাইব, আবার পাইব, যেটি ছিল, সেইটিই

পাইব। ঐ দেখ, সেই সোনার কমল দেবীর পাদপদ্মে ফুটিয়া রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেবী সোনার পদ্মে তাঁহাদিগকে পূজা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। সেই দিনের আশায় আমি গোপনে একটি সোনার পদ্ম প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি, দেবী কোন্ সোনার পদ্ম চাহিয়াছিলেন। কাল রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেবী বলিলেন, 'তোরা সোনার পদ্মে আমাদের পূজা করিয়াছিস্। তোদের ধন আমাদের কাছে রহিল। আবার যখন দু'জনে আমাদের নিকট আসিবি, সেই সময় এই ধন তোদিকে দিব, তোরা বুকে ধরিয়া হৃদয় জুড়াইবি! দেখিস্ যেন আমাদের নিকট হইতে আর দূরে চলিয়া না যা'স্।' আমরা তাঁদের নিকট হইতে বড় দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম, তাই তাঁহারা স্নেহের বন্ধনে আমাদিগকে আবার কাছে টানিয়া লইয়াছেন। তোমার পায়ে পড়ি, আর তাঁদের কাছছাড়া হইও না।"

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সুরেশ্বর বলিল, "না, আর তাঁদের কাছছাড়া হ'ব না। যাঁদের কাছে আমার খোকা আছে, যাঁরা আবার আমার খোকা আমাকে ফিরাইয়া দিবেন, আমি কি আর কখনও তাঁদের ছাড়িব! কিন্তু আমি ত জানি না, কেমন করিয়া তাঁহাদের কাছে যাইতে হয়। তুমি আজ হইতে আমাকে তাহা শিখাও। এতদিন আমি তোমাকে শিখাইয়াছি, দেখিলাম সে শিক্ষায় ভাঙ্গা বুক জোড়া লাগে না, প্রাণের শূন্যতা পূর্ণ হয় না। আজ হইতে তুমি আমাকে নূতন শিক্ষা দাও।"

প্রত্যাগমন

১

'প্রত্যহ এমন কলহ বিবাদ কি ভাল ?'

সুরমা শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছিল। মুখ না তুলিয়াই স্বামীর কথার উত্তর করিল—'কে ঝগড়া করতে ব'লে ?'

'মা যা' বলেন, সেই মত চল্‌লেই ত হয়।'

সুরমা সেই ভাবে থাকিয়াই উত্তর করিল—'আমার দ্বারা তা' হ'বে না।'

'কেন, তা' কি এত শক্ত ?'

'শক্ত হ'ক্ আর সহজ হ'ক্, আমি যেটাকে ভাল ব'লে বুঝি, আর কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ ব'লে মেনে নেওয়া আমার কর্ম্ম নয়।'

'দেখ, সংসারে থাকতে গেলে সকলকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে চল্‌তে হয়। সকলেরই মন যে একরকম হবে তা' এ পৃথিবীতে অসম্ভব। মা যা' ভাল মনে করেন, তুমি তা' ভাল মনে কর না। মা'য়ের এ বয়সে তাঁর সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করা যত অসম্ভব, তোমার পক্ষে তত অসম্ভব

নয়। তুমি যদি একটু জেদ ছাড়, তা হ'লে আমি মা'কে বুঝিয়ে দেখ্‌তে পারি। কি বল ?'

সুরমা ভ্রুকুটিকুটিলনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রাখ্‌তে চাও ?'

কি সুন্দর মুখখানি! বিরক্তিব্যঞ্জক হইলেও তাহা হইতে চোখ ফিরান যায় না! নগেন্দ্র ভাবিল, মহাকবি যথার্থই বলিয়াছেন—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।'

সুরমা আবার পাঠে মন দিল। নগেন্দ্র ধীরভাবে বলিল—

'দেখ, তুমি এমন সুন্দর হ'য়েও সংসারকে অসুন্দর ক'রে তুল্‌ছ কেন ?'

সুরমা পড়িতে পড়িতেই বলিল—'কি ক'রব বল ? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, বিধাতা অসতর্ক হ'য়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে এখন আমি ফিরিয়ে দিই কাকে ? তোমরা আমাকে মেয়ে জ্যাঠা ব'লে দুবেলা গাল দাও। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা—অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম্।'

নগেন্দ্র এই উত্তরে ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—'মেয়ে জ্যাঠা কি আমরা ব'লেছি ? তুমি কি কবিতা লিখেছিলে, ও বাড়ীর পুঁটী তা নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখায়। তাই লোকে এই কথা বলেছে। নিজের লেখা সাবধান ক'রে' রাখ্‌লেই ত হয়।'

সুরমা সক্রোধে বলিল—'আমি কি জান্‌তুম—পাড়াগেঁয়ে মেয়েগুলো এত চোর ?'

নগেন্দ্রের ক্রোধ হইয়াছিল ; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। বুঝিল এরূপস্থলে ক্রোধে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পুনরায় ধীরভাবে বলিল, 'দেখ, মা তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তোমার সে দিন সামান্য একটু অসুখ করেছিল, মা ভাবনায় অস্থির ; ঠাকুরের কাছে কত মানসিক ক'রেছিলেন।'

সুরমা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—'সে কেন জান ? আমি ম'লে এক রাশ টাকা দিয়ে আর কেউ তোমার সঙ্গে মেয়ের বে দেবে না। আমার বাবার মত বোকা ত আর জগতে দ্বিতীয় নাই !'

নগেন্দ্র এই তীব্র বিদ্রূপে নিতান্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইল। তথাপি অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল—'আমাকে যা' ইচ্ছা বল, কিন্তু আমার স্নেহময়ী সরলা জননীর উপর এ স্বার্থপরতার আরোপ ক'র না। মায়ের আমার মনে মুখে এক।'

'তা জানি !'

নগেন্দ্র এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল—'না, তা' জান না। জান্‌লে কখনও একথা ব'ল্‌তে না। আমি মায়ের এক সন্তান, তুমি তাঁর কত আদরের এক বউ, তার বড় লোকের মেয়ে। তোমাকে যে তিনি

কত ভালবাসেন, কত আদর যত্নে রাখ্‌তে চান্, তোমার হৃদয়ে এতটুকু যদি সহানুভূতি থাক্‌ত, তা'হ'লে তা' বুঝ্‌তে পার্‌তে। তোমার রাগের কারণ—তিনি তোমার দু'বেলা ঘাটে গিয়ে সাবান মাখা, দিন রাত বই মুখে দিয়ে প'ড়ে থাকা, কবিতা লেখা, বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকা, ঠাকুর দেবতার কাজে, সংসারের কাজে অনিচ্ছা, অশ্রদ্ধা—এই গুলা দেখ্‌তে পারেন না। তিনি এ সব দেখে এত বিরক্ত হন কেন জান?—পাড়াপ্রতিবেশীরা তোমাকে কল্‌কেতার বিবি ব'লে, জ্যাঠামেয়ে ব'লে, কত উপহাস করে, নির্লজ্জ ব'লে গা টেপাটিপি করে। আর মায়েরও ধারণা, গৃহস্থের বউয়ের এরকম চালচলনে লক্ষ্মী ছেড়ে যান। তুমিই বল দেখি, তোমার এই সব কাজগুলো কি এতই ভাল?'

সুরমার সুন্দর মুখখানি যেন অলক্তকরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। সে ক্রোধে বলিল—

'আমার কাজ ভাল কি মন্দ—পাড়াগেঁয়েরা তার কি বুঝ্‌বে?'

নগেন্দ্র এবার রুক্ষভাবে উত্তর করিল—'আমি কি তোমায় জোর ক'রে বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলাম? তোমার বাপ সহুরে লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলেইত পারতেন।'

'বাবার দুর্বুদ্ধি! তিনি কি ভেবেছিলেন,—তুমি বি এ, ফেল হ'য়ে যে পাড়াগেঁয়ে সেই পাড়াগেঁয়েই থেকে স্কুলমাষ্টারি আর চাষার কাজ কর্‌বে? তিনি ত এখনও বল্‌ছেন, তুমি

কল্‌কেতায় গিয়ে আমাদের বাড়ীতে থেকে লেখা পড়া কর। তা' তোমাকে যে পাড়াগেঁয়ে ভূতে পেয়েছে!'

'পাড়াগেঁয়ে ভূতকে যখন এত ঘৃণা, তখন বাপের বাড়ী থেকে না এলেই পারতে।'

'বিয়ের পর এই দেড় বৎসর কি এসেছিলুম, না ইচ্ছে ক'রে আস্‌তুম্? তোমার বাপ আনতে গেলেন যে!'

'তাকে ফিরিয়ে দিলেই ভাল হ'ত।'

'বাবা অতটা অভদ্রতা ক'র্‌তে পার্‌লেন না। কিন্তু দেখ্‌ছি—ফিরিয়ে দিলেই ভাল হ'ত। এই মাসখানেক এসেছি, এতেই যেন আমার মর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে।'

সুরমা ক্রন্দনের সুরে এই কথা বলিয়া চক্ষু আবৃত করিল। নগেন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যাপার্শ্ব হইতে মুক্ত বাতায়নের নিকটে গেল। শরতের নির্ম্মল আকাশে দশমীর চাঁদ হাসিতেছে; চাঁদের কিরণ পুকুরের জলে নাচিতেছে, গাছের মাথায় বিশ্রাম করিতেছে। প্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে নগেন্দ্রের প্রথম যৌবনের প্রেমপিপাসু নির্ম্মল হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে শয্যাশায়িতা সুন্দরী পত্নীর দিকে চাহিল, দেখিল সুরমার সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের কিরণে ভরিয়া গিয়াছে, যেন এক রাশ চাঁপাফুলের উপর কে এক রাশ শেফালিকা ঢালিয়া দিয়াছে। সে ধীরে ধীরে আবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্নীর হাতখানি ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল,—'ছি! কাঁদিতেছ? আমি তোমাকে কষ্ট দিবার জন্য কোনও কথা বলি নাই।'

তথাপি সুরমা মুখের কাপড় খুলিল না। সজোরে স্বামীর হাত হইতে আপনার হাত সরাইয়া লইয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। নগেন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইল; কম্পিত কণ্ঠে বলিল—'একটা মস্ত ভুল উভয় পক্ষেই হ'য়েছে, কিন্তু তা' শোধ্‌রাবার ত আর উপায় নাই! তোমাকে সুখী কর্‌বার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কেউ তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না!' একটু থামিয়া পরে বলিল—'কিন্তু নারাণপুরের মুখুয্যেদের মেজ বউ, তোমার বিন্দু দিদি—সে ত কল্‌কাতার মেয়ে—তোমার বাপের চেয়েও তার বাপ বড়লোক—কিন্তু তার সুখ্যাতি সকলেই করে। সে ত পাড়াগেঁয়ে ব'লে কাহাকেও ঘৃণা করে না। আমি পাড়াগেঁয়ে হই, আর দরিদ্রই হই; তোমার স্বামী। আমার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত? স্বামী মূর্খ, দুশ্চরিত্র, দরিদ্র হ'লেও স্ত্রীর'—

'পূজার পাত্র। -এই কথা বল্‌বে ত? না, তা নয়। স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন অন্যায় দাবী আমি স্বীকার করি না। এই শোন,—রবিবাবুর মৃণাল তার স্বামীকে কি লিখেছিল।' বলিয়া সুরমা বইখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল—

"কুষ্ঠরোগীকে কোলে ক'রে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়ীতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগ্‌ছিল; জগতের মধ্যে অধমতার, কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার ক'রে আস্‌তে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি!"

সুরমা বলিল—'আমাকে যদি তোমরা আর বিরক্ত কর, তা' হ'লে এই মৃণালের মত আমিও এক দিকে চ'লে যাব।'

নগেন্দ্র কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে মেঝের উপর আসিয়া বসিল,এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রশ্নোত্তর সংশোধন করিতে লাগিল।

ফুলশয্যার রাত্রি হইতে আজ পর্য্যন্ত এই নব দম্পতির নৈশ প্রেমালাপ এই পদ্ধতিতেই চলিয়া আসিতেছিল।

২

ভাদ্রের অপরাহ্ন। নারাণপুরের মুখুয্যেদের বড় ঘরের রোয়াকে বসিয়া মেজ বউ মহাভারত পড়িতেছে; তাহার যাতৃদ্বয় ও কয়েকজন প্রতিবেশিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। একটি খোকা মেজ কাকীমা'র গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সাবিত্রীর উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে।

এমন সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি সুন্দরীকে উঠান দিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিতনেত্রে সেই দিকে চাহিলেন। সুন্দরী কাছে আসিতেই মেজ বৌ চিনিল। পুস্তকখানি ভূমিতে রাখিয়া ও খোকাকে তাহার জননীর কোলে দিয়া, মেজ বউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠানে নামিয়া গেল, এবং

সুন্দরীর হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া আনিল। আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিল—'রমা, হঠাৎ যে? বাড়ীর সব ভাল ত?'

সঙ্গে দাসী ছিল, বলিল—'হাঁ, সব ভাল। আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে বৌদিদির বড় ইচ্ছে হ'ল, তাই এসেছেন।'

'তা' বেশ ক'রেছ বোন্‌।'

মেজ বৌয়ের শাশুড়ী বলিলেন—'ওমা, তোমার মামাতো বোন্‌ রায়পুরের চাটুয্যেদের বউ? আহা দিব্যি মেয়েটি ত। তা' বেশ ক'রেছ মা, এসেছ, এস ব'স।'

মেজ বউ গোপনে ইঙ্গিত করিল। সুরমা সেই ইঙ্গিতক্রমে দিদির শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তিনি সুরমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন—'সুখে থাক মা, সীঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক্‌। চাঁদের মত একটি খোকা হ'ক্‌। বুড়ী, একটা আসন এনে দাও ত দিদি!'

বুড়ী আসন আনিবার পূর্ব্বেই সুরমা দিদির পার্শ্বে মাটীর উপরেই উপবেশন করিল। দত্ত-গৃহিণী বলিলেন—'এ কি নগেনের বউ?'

মেজ বউ বলিল—'হাঁ। তুমি কি নগেনকে জান, কায়েত-কাকী?'

'ও মা সে কি কথা গো? নগেনকে আর আমি জানিনি? সে আর আমাদের হাবু যে বরাবর একসঙ্গে পড়েছে। নগেন কতবার আমাদের বাড়ীতে এসেছে। অমন ছেলে হয় না—

রূপে গুণে সমান। কি মিষ্টি কথা! কেমন ঠাণ্ডা স্বভাব! লোকের বিপদ আপদে প্রাণ দিয়ে উপকার করে।'

মেজ বৌয়ের শাশুড়ী বলিলেন—'মাগীর কপাল ভাল, যেমন ছেলে তেমনি বউ হয়েছে।'

ঘোষাল জ্যাঠাই বলিলেন—'মেজ বৌমা, বেলা গেল, সাবিত্রীর কথার যেখান্‌টা আরম্ভ কর্‌লে, সেটা শেষ ক'রে ফেল, শুনে বাড়ী যাই; ঠাকুর দেবতার কথা অর্দ্ধেক ব'লে রাখ্‌তে নেই।'

মেজ বউ পড়িতে লাগিল—

"সাবিত্রী-মাহাত্ম্য-কথা অতি চমৎকার।
যার নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্ব ভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন॥"

অধ্যায়পাঠ শেষ হইল। শ্রোত্রীমণ্ডলী স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমাকে লইয়া মেজ বৌ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩

সুরমা বলিল—'দিদি, বাড়ী যাব, এ জন্মে আর এ মুখ কর্‌ব না। তাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।'

'এই ত সে দিন এসেছিস্‌, এর মধ্যে আবার যাবি? সেখানকার খবর ভাল ত?'

'ভাল, কিন্তু এ পাড়াগেঁয়েদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি, বিন্দু দিদি! মরণ হয় ত বাঁচি।'

সুরমার চোখে জল পড়িতেছিল। বিন্দু সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—'ছিঃ, ও কথা কি বল্‌তে আছে? কি হ'য়েছে বল্‌ দেখি?'

'কেন, তুমি কি আমার শ্বশুরবাড়ীর সুখের কথা জান না?'

'কৈ না! তাঁরা ত লোক ভাল শুনি। আর নগেন ত তোকে খুব ভালবাসে।'

'অমন ভালবাসার মুখে ছাই। পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাষ্টার, চাষার কাজ করে, তার আবার ভালবাসা।'

বিন্দু হাসিয়া উঠিল। বলিল—'সহরে বড়লোকের ছেলে, উকীল, ডেপুটি না হ'লে ভালবাস্‌তে জানে না, বুঝি?'

সুরমা বিরক্ত হইয়া বলিল—'কি হাস বিন্দু দিদি? গা জ্বালা করে। পাড়াগাঁ তোমারই ভাল লেগেছে। আমি হ'লে এ শ্মশানপুরীতে লাথি মেরে বাপের বাড়ী চ'লে যেতুম।"

বিন্দু ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিল—'ছি বমা! গৃহস্থের বাড়ীকে কি শ্মশান বলতে হয়?"

সুরমা ঈষৎ লজ্জিত হইল, বলিল—'অল্প দুঃখে কি এ কথা মুখ দিয়ে বের হয় দিদি?'

বিন্দু বলিল—'তোর দুঃখটা কি তাই বল্ না!'

আমি সাবান মাখি, নাটক নভেল পড়ি, কবিতা লিখি, বেলায় উঠি, কাজ কর্ম্ম জানি না; আমার মত বউ সংসারে থাকলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। আর কত ব'লব?'

'তাঁরা এ সব পছন্দ করেন না, আর তোমার এ সব না হ'লে চল্‌বে না। এই ত? তা, দিদি, অবস্থা বুঝে কাজ না করলে কি কেউ সুখী হ'তে পারে? যত দিন না বে হয়েছিল, ততদিন বাপের আদরের এক মেয়ে, যা মনে হয়েছে, তাই ক'রেছ। কিন্তু এখন যে তুমি বউ।'

'হলেমই বা বউ! বউ ব'লে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? এবার হ'ল কি শোন। বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় বৌদিদিকে বলে এসেছিলুম—ভাই, আমাকে ত বনবাসে পাঠাচ্ছ। তা' দয়া ক'রে একটি কাজ ক'র—নূতন নাটক নভেল কিছু বেরুলেই তাকে পাঠাইয়া দিও; জানত পাড়াগাঁ,

মূর্খের দেশ, কাহারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না। বই না পেলে পাগল হ'য়ে যাব। তা' বৌদিদি দয়া ক'রে ক'খানি বই পাঠাইয়াছেন। এই শাশুড়ীর রাগ দেখে কে?—"এ সব বিবিয়ানী চল্‌বে না—গেরস্তর বউ রাতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়্‌লে লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে—" সে কত কথা, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব? আমি রাগ না সাম্‌লাতে পেরে আপন মনেই ব'লে ফেল্‌লুম—"পাড়াগেঁয়ে লোক কল্‌কেতা থেকে বউ আন্‌তে গেছলে কেন?" শুন্‌তে পেয়ে আর যায় কোথা? ছেলেকে কত কথা বল্‌লে। বলে কি না—আবার ছেলের বে দেবে। দিক্‌ না, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই, আমার হাড় জুড়াক্‌।'

'তা' নগেন কি বল্‌লে?'

'মাষ্টার মহাশয় মাষ্টারী চালে কত উপদেশ দিতে লাগলেন। আমি বল্‌লাম—"দেখ, আমি কচি খুকী নই; উপদেশ দিতে হয় স্কুলের ছেলেদের দাওগে। এ পাড়াগাঁয়ে আমি কোনও মতে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার পরামর্শ শোন, কল্‌কেতায় চল, বাবা যা বলেছেন, তাই কর। আমাদের বাড়ীতে থেকে আবার বি এ পাশ কর্‌বার চেষ্টা কর। তার পর ওকালতী পাশ দিয়ে দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরোও।" এ কথায় তাঁর মানে বিষম আঘাত লাগ্‌ল। বাবু ফোঁস্‌ ক'রে বল্‌লেন—"কি! ঘরজামাই হ'তে বল? আমি বাপ মায়ের এক ছেলে, আমার কিসের অভাব?"—এই

রকম কত কি বক্‌তে লাগ্‌ল—একটু কাঁদা হ'ল। আমি শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে আমিও কারও সঙ্গে কথা কইলুম না, আমার সঙ্গেও কেউ কথা কইলে না। প্রত্যহ এ ঝগড়ার চেয়ে বাপের বাড়ী যাওয়াই ভাল। তাই ঝিকে দিয়ে পালকী আনিয়ে চলে এসেছি। এইখান্ থেকে বাবাকে চিঠি লিখ্‌ব। বাবা লোক পাঠালেই চ'লে যাব। এক সঙ্গেই যাই চল না, বিন্দু দিদি! তুমিও ত অনেক দিন বাপের বাড়ী থেকে এসেছ।'

বিন্দু বলিল—'আমার এখন কি ক'রে যাওয়া হবে বোন্? সেজ বউ ও মাসে প্রসব হবে। আমার শ্বাশুড়ীর শরীর ভাল নয়. বড়দিদিও ছেলে পিলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তার উপর ঠাকুরের সেবা আছে। আমি না হ'লে কে ভোগ রাঁধবে?'

'তুমি যে কি দিয়ে গড়া, বিন্দু দিদি, তা' বুঝতে পারলুম না। অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে। রাজা বাপ কত সাধ্য সাধনা করলেন, নিজের কাছে নিয়ে রাখ্‌তে। তা' তুমি কি না এই পাড়াগাঁয়ে থেকে এক বেলা দু'মুঠো অশ্রদ্ধার ভাত খাচ্ছ!'

বিন্দু রুক্ষ স্বরে বলিল—'অশ্রদ্ধার ভাত কেন রমা?'

সুরমা ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'তা' দিদি, দিন রাত দশটা দাসীর খাটুনী খাটলে সকলেই শ্রদ্ধা করে।'

বিন্দু কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার শ্বাশুড়ী

একখানি থালায় খাবার ও এক গেলাশ জল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—'মেজ মা!'

'কেন মা!'

'বাছা কখন্ এসেছে, একটু জল খেতে দাওনা মা!'

সুরমা উত্তর করিল—'আমি এখন কিছু খাব না।"

'তা কি হয় মা! আমাদের পাড়াগাঁয়ে কোথা কি পাব, মেজমা বাড়ীতে রসকরা ক'রেছিলেন, তাই গোটা কতক খেয়ে একটু জল খাও মা! তুমি এসেছ শুনে কর্ত্তা ভারি খুসী হ'য়েছেন। আজই নগেনকে আন্‌বার জন্তে লোক পাঠাইয়া দিতেন, তা' আকাশে মেঘ দেখে আর পাঠান হ'ল না। কা'ল নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌বেন। ছেলে বউ এক সঙ্গে না থাক্‌লে কি ঘর মানায়?'

গৃহিণী সুরমাকে কোলে বসাইয়া জোর করিয়া গোটা-কয়েক রসকরা খাওয়াইলেন। পরে যাইবার সময় বলিলেন—'মেজ মা, এ বেলা আর তোমায় রাঁধতে হবে না। যাও, কাপড় কেচে এসে দু'বোনে নিশ্চিন্ত হয়ে গল্প কর।'

বিন্দু বলিল, 'না মা, তুমি আগুনতাতে যেও না, আবার অসুখ করবে। ভারি ত রান্না, কতকক্ষণ লাগ্‌বে। চ' রমা, কাপড় কেচে আসি।'

৪

রাত্রে সুরমা দিদির কাছে শয়ন করিয়া বলিল—'দিদি, তোমার শাশুড়ী যে নূতন মানুষ দেখছি। শুনেছি উনিও

তোমাকে বড় কম জ্বালান্‌নি। ছেলে যাতে বউকে দেখ্‌তে না পারে, সে জন্যে ছেলের কাছে বউয়ের নামে কত লাগাতেন। এখন বউয়ের কপাল পুড়েছে, বউ দাসীর মত খাটছে, তাই বুঝি বউয়ের আদর হ'য়েছে?'

বিন্দু বলিল,—'রমা! মানুষ মানুষকে যত দিন আদরের বস্তু ব'লে না চিন্‌তে পারে, ততদিন তাকে কেমন ক'রে আদর করবে ভাই? আমরাই কি একেবারে সকলকে আদর যত্ন ক'রে থাকি? শ্বশুর শ্বাশুড়ী যে বউকে দেখতে পারেন না, তার কারণ, আমার ত মনে হয়, তাঁরা ভয় করেন যে, বউ প্রাণের সামগ্রী তাঁদের ছেলেকে পর ক'রে দেবে। তার উপর যদি বৌ হ'তে তাঁদের মর্য্যাদার হানি হয়, তা হ'লে ত কথাই নাই। কিন্তু বউ যদি এমন ভাবে চলে যে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর এই দুইটি ভয় না থাকে, তা' হ'লে কোনও গোলই হয় না।'

'আমার শ্বাশুড়ীর আমি কি করেছি ভাই, যে তিনি আমার উপর এত অত্যাচার করেন?'

'তুমি কি কর নাই ভাই! তুমি ত তাঁর ছেলেকে তোমার বাপের বাড়ী নিয়ে গিয়ে একেবারে পর ক'রে দিতে চাও'—

'তা আমার বাপের বাড়ীই কেন? কল্‌কেতায় আলাদা বাসা ক'রেই না হয় থাকুক না; শ্বশুর শ্বাশুড়ীও সেখানে থাকতে পারেন।'

বিন্দু হাসিয়া বলিল—'বেশ কথা। তুমি চৌদ্দ পনর বৎস-

ঘরের মেয়ে, কল্‌কাতা ছেড়ে স্বামীর কাছে থাক্‌তেও তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না; আর তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী আজ পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধ'রে যে দেশের জলবাতাসে মানুষ হয়েছেন, সহস্র বন্ধনে যে দেশের মাটির সঙ্গে বাঁধা র'য়েছেন, তুমি এই বয়সে তাঁদের সেখান থেকে টেনে ছিঁড়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চাও! কেন না, তোমার মত ক্ষুদ্র বালিকার পাড়াগাঁ ভাল লাগে না! এটা যদি তাঁদের অসহ্য হয়, সে জন্য কি তাঁদের দোষ দেওয়া যায় ভাই? তাঁরা এদেশের দশ জনের এক জন। তোমার শ্বশুরবাড়ী আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে এক ক্রোশ দূর। কিন্তু এখানে একটা সামাজিক কথা উঠলে, তোমার শ্বশুরকে ডাকা হয় তার মীমাংসা করতে। কিন্তু কল্‌কেতায় তিনি কে?'

সুরমা কোনও কথা কহিল না। বিন্দু বলিতে লাগিল—'তার পর দেখ, তুমি এখানে এসে কল্‌কেতার চালে চল্‌তে গেলে, পাড়াগেঁয়ে লোক ব'লে এঁদের ঘৃণা কর্‌তে লাগলে'—

'না দিদি, আমি প্রথম প্রথম একদিনের জন্যও ঘৃণার কথা মুখে আনি নাই।'

'মুখে বল নাই, কিন্তু মনে ব'লেছ ত! তা' ভাই, মানুষের মন অন্তর্যামী। এই ছেলেটা দেখ না—তিন বছরের ছেলে, আমি মেরে কুটে দিলেও আমাকে জড়াইয়া ধরিবে, কিন্তু ও বাড়ীর ঠান্‌দিদি খাবার দিতে এলেও নেবে না। মনের ভাব মুখে না প্রকাশ করিলেও কোথা দিয়ে কি ক'রে যে আমাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায়, তা' আমরা

বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু অপরে ঠিক ধ'র্‌তে পারে। কাজেই তোমার ঘৃণায় এঁদের আত্মমর্য্যাদার হানি হয় না কি? তুমি ভাই, এত পড়, এটা বোঝ না কেন?'

বিন্দু চুপ করিল, ভাবিল, সুরমা কিছু উত্তর করিবে। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া ব লতে লাগিল—

'আর দেখ, নিত্য সাবান মাখা, নাটক নভেল পড়া—এ সব এ দেশে নূতন। নূতন একটা কিছু হ'লেই লোকে তা অনেকটা অপ্রীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখে। তোমার শ্বাশুড়ী যদি তা' নাই চান, নাই বা কর্‌লে। তুমি যদি ও সব বিষয়ে অত জেদ না কর, তাঁরাও এ সব নিবারণের জন্যে অত জেদ কর্‌বেন না। আর বই পড়া—মাঝে মাঝে তোমার শ্বাশুড়ীকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিও দেখি, তা হ'লে তোমার পড়াশুনায় তিনি আপত্তি কর্‌বেন না। কিন্তু তা'ও বলি ভাই, অত নাটক নবেল, বিশেষতঃ আজকাল অপরিণত-বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকাদের মাথা বিগড়ে দেবার জন্ম যে সব বই লেখা হ'চ্ছে, তা পড়া ভাল নয়। এবার কল্‌কেতায় গিয়ে একখানা বই পড়লুম, তাতে আমাদের হিন্দু সমাজের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে বিদ্রূপ করা হ'য়েছে, এমন কি, প্রকারান্তরে সীতা দেবীর চরিত্রে পর্য্যন্ত কটাক্ষ করা হ'য়েছে! গা শিউরে উঠ্‌ল! হিন্দুর মেয়ে সীতার মত সতী হ'ব, তাঁর মত চির-পবিত্র হ'য়ে, স্বামিভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখিয়ে, মাটীর শরীর মাটীতে মিশুয়ে দেব, এই গর্ব্বই আমরা ক'রে থাকি। সেই

মা জানকীর সতীত্বে কটাক্ষ! হিন্দুর বংশে জন্মে এ কথা লিখ্‌লে কি ক'রে? নাটক নভেলের নায়ক নায়িকা প্রায়ই পোস-পোষাকী বিলাসী নব্য বাবু আর তাঁহার বিলাসিনী স্ত্রী। তাদের অন্য কোন কাজ নাই, কেবল প্রেমের কথা—প্রণয়গুঞ্জন! প্রেমের এত অযথা ছড়াছড়িতে এই পবিত্র মধুর জিনিষটাতেও ক্রমে লোকের অরুচি হ'য়ে যাচ্চে! সংসার কি কেবল সুখের ফুলশয্যা! কত লোক দুঃখের পাথরভাঙ্গা রাস্তায় গড়াতে গড়াতে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে যে! এই সব কারণে এই সমস্ত আধুনিক লেখার উপর আমার যার-পর-নাই অশ্রদ্ধা হ'য়েছে।'

সুরমা বলিল—'দিদি, তুমি এ সব শিখ্‌লে কোথা?'

বিন্দু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'তুই যে স্কুলমাষ্টারের নিন্দা কর্‌ছিস্, সেই একজন পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাষ্টারের কাছে।'

সুরমা বলিল, 'বুঝেছি, জামাইবাবুও ওই স্কুলে মাষ্টারী কর্‌তেন শুনেছি।'

বিন্দু কম্পিতকণ্ঠে বলিল—'রমা, ভাগ্যদোষে তাঁকে হারিয়েছি। তিনি মানুষ ছিলেন না রে, দেবতা! তাঁর হাতে না পড়লে, আমি হয় ত তোরই মত হ'তুম। বাপের আদরের গর্ব্বে, ধনের গর্ব্বে, অল্প শিক্ষার গর্ব্বে, নিজের চারি-দিকে আত্মাভিমানের এমন উঁচু পাথরের প্রাচীর গ'ড়ে বস্‌তুম যে, চিরকাল একাকীই তার মধ্যে বাস ক'রে, শেষে উপকথার রাজকন্যার মত নিজেই পাথর হ'য়ে যেতুম। আমি তোর চেয়ে কম পড়িনি, তোর চেয়ে কম আমার আত্মাভিমান ছিল

না। কিন্তু আমি স্পর্শমণি পেয়েছিলুম, তাই আমার লৌহজন্ম ঘুচে গেছে।'

উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল। সুরমা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—'আজকালকার অনেক বই প'ড়ে মনটা কি রকম যেন হ'য়ে পড়ে দিদি, তা' বুঝ্তে পারি—যেন যা' আছে তার কিছু ভাল লাগে না! যা' বাস্তব তাতে মন সুখের কিছু দেখে না, অবাস্তবের দিকে ছুটে যায়।'

বিন্দু বলিল—'এই দেখ্না, রমা, তুই ঐ সব বিষ খেয়ে খেয়ে, এমনই হ'য়েছিল্ যে, পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাষ্টার ব'লে অমন দেবচরিত্র স্বামীর বুকভরা অকলঙ্ক পত্নীপ্রেমকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করতে আরম্ভ ক'রেছিস্! কেন রে, এরা কি মানুষ নয়? এদের কি হৃদয় নাই? কাল তুই নগেনকে অত রূঢ় কথা বল্লি, তার মা'কে অপমান কর্লি, পাড়াগেঁয়ে ব'লে তাদের কত ঘৃণা কর্লি, কিন্তু সে তোকে একটি রূঢ় কথা বল্লে না! শুনেছি, প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার এক অনাথা বিধবার উপর অত্যাচার ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল ব'লে সে একা লাঠী হাতে তাকে শাসন করতে গিয়েছিল। কিন্তু তুই স্ত্রী, তুই তাকে মর্ম্মান্তিক অপমান কর্লি—তেজস্বী যুবা বালকের মত কাঁদ্লে! বল্ দেখি তার বুকে কত ব্যথা বেজেছে! আর এই যে চ'লে এলি, সে তাদের কি অপমান ক'রে এলি! নগেনের বাপ একজন দলপতি। তাঁর বউয়ের এ আচরণে তাঁর মাথা কত হেঁট হ'য়েছে! স্বামিনিন্দা শুনে সতী দেহ ত্যাগ ক'রেছিলেন যে রে! আর

তুই নিজের মুখে অমন দেবতার মত স্বামীর নিন্দা কর্‌লি! সাবিত্রীর উপাখ্যান ত শুন্‌লি? রাজার মেয়ে বনবাসীর গলায় মালা দিয়ে বনকে স্বর্গ ক'রে তুলেছিলেন!'

এবার সুরমা কাঁদিল। বালিশে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—'তা' দিদি, আমি যে ওঁদের কষ্ট দিবার জন্যেই এ সব বলি, তা' নয়। অনেক সময় ব'লে ফেলে মন কেমন করে। এক একবার মনে করি, ওঁরা যা' বলেন, তাই কর্‌ব, কিন্তু সে ভাব আবার কোথায় চ'লে যায়। তার চোখে জল দেখে আমার কি একেবারেই কষ্ট হয় নাই দিদি? তা' নয়। একবার ইচ্ছা হ'ল, হাতে ধ'রে ক্ষমা চাই, কাঁদ্‌তে বারণ করি। কিন্তু তা' পারলুম না। কে যেন গলা চেপে ধ'র্‌লে।'

'গর্ব্ব, বোন্‌, গর্ব্ব! বাপের এক মেয়ে, চিরকাল দর্পে দম্ভে কাল কাটিয়েছ, সুশিক্ষা ত হয় নাই। কিন্তু রমা, হিন্দুর ঘরের মেয়ে আমরা, আমরা দেবী হ'ব, আমরা পরের জন্য নিজের প্রাণ দেব! নীলকণ্ঠের মত, যত অমঙ্গলের বিষ আমরা খেয়ে, সংসারকে সুধাময় ক'রে তুল্‌ব। আমাদের আদর্শ মা জানকী—সাবিত্রী। আমরা পশুর মত আত্মসুখ খুঁজে বেড়াব কেন রে? পৃথিবীতে সব জিনিসই কি নিজের মনের মত হয়? কিন্তু মনের মত হয় না ব'লে নিজে অসুখী হওয়া ও অন্যকে অসুখী করা কি ভাল? যা মনের মত নয় তাকে মনের মত ক'রে নিতে হ'বে, যা অসুন্দর তাঁকে সুন্দর

ক'রে তুল্‌তে হ'বে। এই ত বাহাদুরী, এই ত মহত্ত্ব। মানুষের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের, এতেই সম্মান—এতেই গর্ব্ব।'

এবার সুরমা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে বলিল—'দিদি, ওঁদের মুখে তোমার এত সুখ্যাতি কেন, তা' আজ বুঝলুম। কেন তুমি বাপের স্বর্ণ-অট্টালিকা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ীতে প'ড়ে আছ, তা' বুঝেছি। বল্‌তে কি, যে তুমি কারও একটি কথার ঘা সহ্য কর্‌তে পারতে না, তুমি সেই বিন্দু দিদি হ'য়ে কি ক'রে সকলকে বশ ক'র্‌লে, তা' নিজের চোখে দেখ্‌ব, ইহাই আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে—স্পর্শমণির স্পর্শে আমারও, বোধ হয়, এবার লৌহজন্ম ঘুচে গেল।'

৫

সুরমা যখন পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, তখন দেখিল, তাহার দিদি তাহার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। বাড়ীর অন্য সকলেও উঠিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছে। বিন্দু গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া স্নানান্তে ঠাকুরঘরের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। কক্ষের বাহির হইতে সুরমার লজ্জা করিতে লাগিল। এমন সময় খোকা 'কাকী মা, কাকী মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলিয়া কোলে করিল। খোকা, বোধ হয়, ঘুমের ঘোরে তাহাকে 'কাকী-মা'ই মনে করিল: কারণ, সে সুরমার কোলে গিয়া আর কাঁদিল না।

সুরমা খোকাকে কোলে লইয়া কক্ষের বাহির হইতেই বড় বউ তাহার সম্মুখীন হইল। বড় বউ হাসিতে হাসিতে বলিল—'এই যে চুপ ক'রেছে। মেজ কাকীমাকে না দেখ্‌তে পেলে ছেলেগুলি যেন পাগল হয়। ঐ দেখনা ভাই, সব ছেলে মেয়েরা ব'সে আছে। মেজ কাকীমা এসে খাবার দেবে তবে খাবে, আমাদের দেওয়া মনে ধরে না।'

বিন্দুর শাশুড়ী সুরমাকে ছেলে কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া বলিলেন—'দু'টি বোন্‌কে কি ভগবান্ এক ছাঁচে গ'ড়েছিলেন! এই দেখ না, মা আমার কতক্ষণই বা বাড়ীতে এসেছেন, এরই মধ্যে ছেলেদের আপনার ক'রে নিয়েছেন! কল্‌কেতার মেয়ে না হ'লে কি এত গুণ হয়?' সুরমা ভিতরে ভিতরে লজ্জায় পুড়িতে লাগিল।

বড় বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল—'তা' মা, কল্‌কেতার মেয়ের কাছ থেকে আমরাও অনেক শিখেছি।'

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'শিখেচ বৈ কি, মা, শিখেছ বৈ কি।'

এমন সময় বিন্দুর শ্বশুর ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সুরমাকে দেখিয়া বলিলেন—'এই বুঝি আমার রায়পুরের বৌ-মা গা?'

সুরমা খোকাকে তাহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ বাষ্পগদগদকণ্ঠে কত আশীর্বাদ,

কত প্রশংসা করিলেন। শেষে বলিলেন—'আজ আমি বিকালে নিজে গিয়ে নগেনকে নিয়ে আস্‌ব। জেলেদের খবর দিয়েছি, একটা বড মাছ ধর্‌তে।'

সুরমা, নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে, যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে তুলসীতলা পরিষ্কার করিতে লাগিল। শ্বশুর বলিলেন—'মেজ মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছিলাম। তুমি ত, মা, গরু, গরু ক'রে পাগল হ'য়েছ, একটা ভাল গরু পাওয়া গেছে, নেব কি?'

মেজ মা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। বৃদ্ধ তথাপি বলিলেন—'কিন্তু মা, আমার তত মত হয় না; কেবল তোমারই খাটুনি বাড়বে। যদো বেটার দ্বারা গরুর 'যা' যত্ন হয়, তা' ত দেখেছ?'

বিন্দু ঘোমটার ভিতর হইতে অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—'গরু না হ'লে কি গৃহস্থের ঘর মানায়, বাবা! যে দিন থেকে দুধ কেনা আরম্ভ হ'য়েছে, সে দিন থেকে আপনার শরীর আধখানি হ'য়ে গেছে।'

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মেজ মা'র আমার ইচ্ছা, আমি বুড়ী কি নেপুর মত হই, আর উনি আমাকে মনের সাধে খাওয়ান। আর কেউ আমাকে রোগা হ'তে দেখে নি,

উনিই আমার শরীরের জন্যে ভেবে অস্থির! তবে যাই, গরুটা কিনে আনি, মেজ মা যখন ধরেছেন, তখন ত আর ছাড়্বেন না।'

৬

'দিদি, একখানা পাল্কী আন্তে বল না।'

'এত সকালে পাল্কী? কোথা যাবি?'

'বাড়ী যাব।"

'কোথা?'

'শ্বশুরবাড়ী।'

'তা কি হয়? আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী না খাইয়ে যেতে দেবেন কেন? ও বেলা নগেনকে আন্বার কথা হচ্ছে। আমি একখানা ভাল ক'রে চিঠি লিখে দেব, সে আস্তে অমত কর্বে না।'

'না দিদি, তুমি যেমন ক'রে পার, তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মত করাও।'

'এত ব্যস্ত কেন বল্ দেখি?'

'কা'ল থেকে আমার শ্বাশুড়ী উপবাস ক'রে আছেন।' বলিয়া সুরমা কাঁদিতে লাগিল।

'উপবাসী আছেন, তুই জান্লি কেমন ক'রে?'

সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আর একদিন আমি রাগ ক'রে না খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিলুম। আমার

শাশুড়ী কত সাধ্য সাধনা করলেন, দোর খুললুম না। তার পর দিন দেখি, হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে আছে, শাশুড়ীও খান্ নাই। একজন অতিথি উপবাসী থাক্‌লে তিনি খান্ না, আমি ত বউ।'

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল—'পাড়াগেঁয়েদের ও একটা রোগ আছে। আমাদের সহরে ও সব বালাই নেই। আর কেউ খাক্ আর না খাক্, নিজের হ'লেই হ'ল।'

পালকী আসিল। বিন্দুর শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে সুরমাকে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিলেন, যেন আপনার কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেছেন। সুরমা সজল নেত্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—

'মা, আবার আসব। এ ত বেশী দূর নয় মা!'

সুরমা পাল্‌কীতে উঠিয়া আবার দিদির পদধূলি লইল, বলিল—'দিদি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমারই মত হ'তে পারি।'

বিন্দু সাশ্রুনেত্রে ভগিনীকে বিদায় দিল।

৭

সুরমা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। গত রাত্রিতে তাহার শাশুড়ী জলস্পর্শ করেন নাই। প্রথমে অভিমানে বউকে উদ্দেশে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ছেলেকে বলিলেন—

'আমারই দোষ রে বাবা! বাস্তবিকই বড় লোকের মেয়ে, চিরকাল কল্‌কেতায় বাস, সে দু'দিন ঘর করতে এসে একেবারে আমাদের মত হ'তে পারবে কেন? তোর আবার বে' দেব ব'লেছি ব'লে সে অভিমানে চ'লে গেছে রে।'

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তাকে বলিলেন—'তুমি এখনই নারাণপুরে গিয়ে বৌমাকে আমার নিয়ে এস।'

পুত্র বলিল—'না বাবা, সে অপমানে কাজ নাই। আপনি আন্‌তে গেলে আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব।'

'অপমান কি রে। ঘরের ছেলে রাগ ক'রে গেছে, তাকে ডেকে আনা অপমান! ঐ বয়সে তোকে লেখাপড়ার জন্যে বক্‌লে তুই যে কতবার রাগ ক'রে না খেয়ে পাড়ার কারো বাড়ীতে গিয়ে ব'সে থাক্‌তিস্। আবার কত সাধ্য সাধনা ক'রে আন্‌তে হ'য়েছে। আর সে বেচারীর দোষই বা কি? চিরকাল যা' ক'রে এসেছে তোদের এখানেও তাই ক'রতে গিয়েছে, তোরা জোর ক'রে তাকে বাধা দিয়েছিস্। জানিস্ না কি, ছেলেরা যদি কোন বিষয়ে গোঁ ধরে, তখন তাদের যত বাধা দেবে তারা ততই সেই কাজ করবে? তা' এ আর আমি তোদের বোঝাতে পার্‌লুম না।'

গৃহিণী পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

'তার দোষ কিছুই নয় গো, যত দোষ আমার। আমি কেন আবার ছেলের বে' দিতে চাইলুম?'

পুত্র বলিল—'নিজে এসে মায়ের পায়ে ধরুক। আন্‌তে যাওয়া কোন মতেই হবে না।'

এমন সময় বউ সত্য সত্যই নিজে আসিয়াই শ্বাশুড়ীর পায়ের উপর পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'মা, আমি তোমার নির্ব্বোধ মেয়ে, আমার সব দোষ ক্ষমা কর।'

শ্বাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বউকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—'ক্ষমা কি মা! তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস।'

* * * *

রাত্রে নগেন্দ্র একাকী আপনার শয়নকক্ষে মেঝের উপর বসিয়া বই পড়িতেছিল। সুরমা নিঃশব্দে যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। নগেন্দ্র জানিতে পারিয়াও কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া শব্দ হইতেছিল। সুরমা স্বামীর হাত হইতে বইখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—'হাঁ গা, তুমি না কি দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে?'

নগেন্দ্র ছাদের দিকে চাহিয়া বলিল—

'ইচ্ছা ত। পাড়াগেঁয়ে চাষার আবার সংসার কি?'

সুরমার বুকে দারুণ আঘাত লাগিল। সে নগেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—'এ দিকে ফিরেই বল না। বলি, গেরুয়া পরে বেরুবে, না একখানা কালাপেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে রাখ্‌ব?'

নগেন্দ্র তদবস্থ থাকিয়াই বলিল—'ভেবে দেখি।'

সুরমা এবার আপনার মৃণালকোমল বাহুদ্বারা নগেন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল—'তবু ছাদের দিকে চেয়ে রইলে? ভাব্‌বে আবার কবে?'

দুই জনে চোখোচোখি হইল। নগেন্দ্র সাশ্রুনয়না সুন্দরী পত্নীর কাতরতাপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। পত্নীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'রমা, তুমি কি সেই রমা?'

রমা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। নগেন্দ্রেরও চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। শেষে রমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে বলিল—'তবে আর গেরুয়া নিয়ে কাজ নাই, কি বল?'

নগেন্দ্র সস্নেহে পত্নীর কিশলয়কোমল হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল—

'তুমি নিতে দিলে কই?'

'এক দিন কিন্তু আমাকে নিয়ে বিন্দু দিদিদের বাড়ী যেতে হ'বে।'

'তথাস্তু।'

সতী মা

আমরা সাত ভাই—তার পরে এক ভগিনী। মাতা ঠাকুরাণীর বড় সাধ ছিল যে, সাত ছেলের বিবাহ দিয়া সাত বউ ঘরে আনিবেন, আর মেয়ের বিবাহ দিয়া জামাইয়ের মুখ দেখিবেন। সে জন্য কন্যা সন্তানের জন্ম হইলেও সনাতন পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া শাঁক বাজান হইল। প্রতিবেশীরা দেখিতে আসিল, চাটুর্য্যে গৃহিণীর সাত ছেলের পর অষ্টম গর্ভে পুত্র সন্তান হইয়াছে। কিন্তু কন্যা দেখিয়া তাহারা হতাশ হইল, বলিল, 'মেয়ে হ'য়েছে তবে শাঁক বাজান কেন?' সূতিকা-গৃহ হইতে সদ্যঃপ্রসূতা জননী উত্তর করিলেন, 'মেয়ে নয় মাণিক!'

প্রাচীন গল্পের স্মৃতি জাগাইয়া সাত ভাইয়ের ভগিনীর নাম রাখা হইল—পারুল। পারুল বড় সুন্দরী—বড় সুকুমার—যেন টোকার ভর সয় না। সে বড় আদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল; কোলে কোলেই বেড়াইত, কখনও মাটীতে পা দিত না। সে হাসিলে আমরা ভাবিতাম, মাণিক ঝরিয়া পড়িতেছে, কাঁদিলে ভাবিতাম, মুক্তা গড়াইতেছে।

পারুল দিন দিন শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় বাড়িতে

। সংসারের কোন কাজই তাহাকে করিতে হইত না। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে পারুল বালিকা বিদ্যালয়ে কিছু বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিল, কিছু পশমের কাজ শিখিল। যখন তাহার বয়স বার, তখনও সে জুতা পরিয়া বিবি সাজিয়া স্কুলে যাইত। প্রতিবেশী মহলে কেহ কেহ সে জন্য আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিত, কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতাম না।

পারুলদের স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি এক অপূর্ব্ব ধরণের ছিল। একদিকে শিবপূজাও শিখান হইত, অন্যদিকে আবার হার্‌মোনিয়ম বাজাইয়া গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। মেয়েরা যখন সারি দিয়া বসিয়া মাটির শিব গড়িয়া ফুল গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিত ও সমস্বরে সুর করিয়া শিবের স্তোত্র পড়িত এবং তাহারই মধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে এ উহার গা টিপিয়া কৌতুক করিত, তখন—ইহাতে বালিকাদের মনে ধর্ম্মভাব যত উদ্দীপিত হউক আর না হউক, কিন্তু দেখিতে শুনিতে বড় মন্দ লাগিত না। আবার পারিতোষিক বিতরণের সময় সভাস্থলে বালিকারা যখন আবৃত্তি, অভিনয় ও গান করিত, তখন তাহাদের সেই থিয়েটারের ধরণ দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে যে ভাবেরই উদয় হউক না কেন—তাহাও দেখিতে শুনিতে বড় মন্দ লাগিত না। প্রতি বৎসর পারুলের অভিনয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত, এবং সে এজন্য বিশেষ পারিতোষিক পাইত। সে বাড়ীতে এক একদিন তাহার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়া সকলকে প্রীত করিত।

পারুলের এইরূপ শিক্ষা ও বেশভূষা আমাদের সংসারে

এক জনের মাত্র ভাল লাগিত না। তিনি আমাদের অশীতিপর পিতামহ। পিতামহ ঠাকুর সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবেই দিন কাটাইতেন। নিজের কক্ষে বসিয়া পূজা আহ্নিক ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

তাঁহারই সমবয়স্ক দুই এক জন বৃদ্ধ ভিন্ন তাঁহার কক্ষে আর কেহ বড় একটা প্রবেশ করিত না। তিনি অধিক লোক-সমাগমও বড় ভাল বাসিতেন না। তিনি একদিন তাঁহার এক অভিমানী বৃদ্ধ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"ভাই, সংসারের, সমাজের এখন আর আমরা কেহ নই। আমাদের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের পক্ষে বনবাসের ব্যবস্থা। জোর করিয়া এখন যদি আমরা সংসারের স্কন্ধে চাপিয়া বসিতে যাই, তাহা হইলে কি কাহারও ভাল লাগিবে? এখন নূতনকে তাহার আসন ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সরিয়া পড়াই ভাল।"

এ বয়সেও তাঁহার চক্ষুর এমন জ্যোতি ছিল যে, ছোট অক্ষরে ছাপা ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল বিনা চসমায় পড়িতে পারিতেন। আর আমার পিতা—তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান—চসমা না হইলে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন। পিতামহ ঠাকুর সংসারের কোন কথায় থাকিতেন না, কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। বৃদ্ধ হইলেও, তিনি আজীবন সংযম-অভ্যাসের দ্বারা নিজের অভাব এমন অল্প করিয়া লইয়াছিলেন যে, প্রায়ই তাঁহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। আমরা প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতাম, তিনি একটি-

বার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন মাত্র। পিতাঠাকুর মহাশয় সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার অনুমতি লইতে যাইলে তিনি প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন ; তাহা হইতেই আমরা তাঁহার সম্মতি বুঝিয়া লইতাম। পারুলের শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁহার প্রীতিকর না হইলেও, সে সম্বন্ধে তিনি কখনও মুখে একটি কথাও বলেন নাই।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। এইজন্য পারুল ত্রয়োদশ উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলে, তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু আর তাহার বিবাহ না দিলে চলে না। সমাজকে ত একেবারে ঠেলা যায় না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সঘরে সুপাত্র মিলিল না। মাতা ঠাকুরাণী বলিলেন যে, তিনি সঘর অঘর বুঝেন না ; এমন জায়গায় বিবাহ দেওয়া চাই, যেখানে তাহাকে কোন প্রকার গৃহকার্য্য, বিশেষতঃ রাঁধা বাড়া করিতে না হয়। আমরাও সঘর অঘর মানিতাম না। তবে কি করা যায়, পিতামহঠাকুর তখনও জীবিত! শেষে ভাল ঘরই মিলিল। এক ছোট রকমের জমিদারের বাড়ীতে পারুলের বিবাহ হইল। পারুল এক শাশুড়ীর এক বউ হইল। শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে বুকে করিয়া লইলেন।

কিন্তু কোথা হইতে এক ভীষণ মোকদ্দমা রাক্ষসী আসিয়া, বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই, পারুলের শ্বশুরবাড়ী ছারখার করিয়া দিল। আজ কোম্পানির কাগজ গেল, কাল গহনা

গেল, ক্রমে জমিদারী গেল, গাড়ী ঘোড়া গেল, দাস দাসী গেল; শেষে যে দিন হাইকোর্টের মোকদ্দমায় পারুলের শ্বশুরের হার হইল, সে দিন তিনি বসতবাড়ী বিক্রয় করিয়া প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের খরচ সংগ্রহ করিয়া উকিলের হস্তে দিলেন. আর স্বয়ং সপরিবারে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পারুলের শাশুড়ী একাই সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, তথাপি বউকে কাজ করিতে দিতেন না—পাছে বউ রোগা হয় এবং বৌয়ের রং ময়লা হইয়া যায়। কেহ বউকে "অপয়া" বলিলে তিনি রাগ করিতেন, দুঃখ করিয়া বলিতেন, "অপয়া আমি, যে অমন একমাত্র সোনার বউকে সুখে রাখিতে পারিলাম না। বাছার দোষ কি?" শেষে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। তখন সংসারের সমস্ত ভার পারুলের উপর পড়িল।

পারুল অন্য কাজ কোনরূপে চালাইয়া লইত, কিন্তু রাঁধিবার সময়ই তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। বাপের বাড়ী কিংবা শ্বশুরবাড়ীর কোথাও তাহার রন্ধনশিক্ষা হয় নাই। তাহার উপর রাঁধা বাড়া কাজে তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তরকারী কুটিতে কুটিতে ও বাটনা বাটিতে বাটিতে হাতে একটা বিশ্রী দাগ হয়, আগুনের তাপে শরীর ম্লান হইয়া যায়; ঘামে ও বাটনার দাগে কাপড় ময়লা হয়; ফেন গালিবার সময় হাতে পায়ে গরম ফেন পড়িতে পারে, কিংবা কড়া হইতে গরম

ঘি বা তেল ছিট্‌কাইয়া গায়ে লাগিতে পারে ; তাহাতে গায়ে একটা অতি বিশ্রি দাগ হইবে। এই সকল কারণে পারুলের আশৈশব একটা ধারণা ছিল যে, যাহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য কেবল সেই স্ত্রীলোকই রাঁধিয়া থাকে। পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের শিক্ষায় তাহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এখন সে নিভৃতে রান্নাঘরে বসিয়া আপন দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কাঁদিত। আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে সমস্ত খরচ দিয়া কন্যার সাহায্যের জন্য রাঁধুনি রাখিয়া দিবেন। কিন্তু পারুলের শ্বশুর দরিদ্র হইয়াছিলেন বটে, আত্মমর্য্যাদা হারান নাই। তিনি বৈবাহিকের এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "বৌমার যথার্থই কষ্ট হইতেছে, আপনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারেন।" কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ইহা নিন্দনীয় ভাবিয়া পিতা ঠাকুর পারুলকে লইয়া আসিতে পারিলেন না।

শেষে মাতাঠাকুরাণীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষ্য করিয়া পারুলকে শ্বশুরবাড়ী হইতে লইয়া আসা হইল। তাহাকে দেখিয়া মা তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পারুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, সব পারি, রাঁধিতে পারি না ; আমার হাতের অবস্থা দেখ।" জননী কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "এখন আর কিছুদিন তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইব না।"

* * * *

পাড়ার ঘোষাল ঠাকুরাণী বলিলেন, "পারুলের মা, পারুলকে আমার সঙ্গে সতী মায়ের স্থানে পাঠাইয়া দাও, সেখানে এক দিন হত্যা দিলে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" ঘোষাল ঠাকুরাণীর উক্তিও যা' আদেশও তা'। তিনি মরা স্বামী যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন; স্মৃতরাং পুরস্ত্রীমহলে তিনি সাবিত্রীর সম্মানই লাভ করিয়াছিলেন। সকল স্ত্রীলোকেরই তাঁহার উপর একটা ভয়মিশ্রিত প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার বাক্য কখনও নিষ্ফল হইবে না। এ জন্য সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। তাঁহার মাথায় সিন্দূর দিতে পারিলে ও তাঁহার পা পূজা করিতে পারিলে, স্ত্রীলোকেরা জন্ম সার্থক মনে করিত। অবিরত সিন্দূর-লেপনে ঘোষাল ঠাকুরাণীর মাথার টাক দেখা যাইত না। দুই একটা মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুঁক শিখিয়া তিনি তাঁহার প্রতিপত্তির মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন।

কোন ব্রত বা পার্ব্বণ উপলক্ষে কোন বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করিলেই, মেয়েরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত, এবং তিনি কেমন করিয়া মরা স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্য অনুরোধ করিত। সে কথা কতবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের নিকট—বিশেষতঃ সধবাদের নিকট—তাহার কেমন একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে, হাজার বার শুনিলেও তাহা পুরাতন হইত না। ঘোষাল-গৃহিণী গম্ভীর ভাবে তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিতেন। তিনি স্বামীর মৃতদেহ

ক্রোড়ে লইয়া একাকিনী অন্ধকার রাত্রে বসিয়াছিলেন ; প্রথমে যমদূতেরা আসিল, তিনি স্বামীর দেহ দিলেন না—তাহারাও সতীর তেজে ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। স্বয়ং যমরাজ আসিয়া কত সাধ্য সাধনা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে বড় বড় চোখ আগুনের মত লাল করিয়া যম বলিলেন—'তোর স্বামী ম'রে গেছে, এখনই ছেড়ে দে ; আমার দশ জন দূতকে তুই তাড়িয়েছিস্।' ঘোষাল-গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, তোমার চোখরাঙ্গানীতে ভয় করি না, তোমার সাধ্য থাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও।' তখন যম নিরুপায় হইয়া মিষ্ট কথায় বলিলেন, 'মা, সতীর কাছ থেকে তার স্বামীকে নিয়ে যাওয়া,—আমি ত কোন্ ছার—স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নয়! কিন্তু কি ক'র্‌ব মা, মরা মানুষকে ত ছেড়ে যেতে পারি না। তাহ'লে আমাকে আর মান্‌বে কে? লক্ষ্মী মা আমার, তুই তোর স্বামী ছাড়া যে বর চাইবি তাই দেব।' কিন্তু সতী স্বামীর জীবন ছাড়া আর কোন বর চাহিল না। অগত্যা যম বাধ্য হইয়া ঘোষাল মহাশয়কে বাঁচাইয়া দিলেন, আর বলিয়া গেলেন—'অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন সতী আর কখনও দেখিনি, তুমি সাবিত্রীর চেয়েও বড়।' শ্রোত্রীবৃন্দ একাগ্রমনে, রোমাঞ্চিত কলেবরে গল্প শুনিত। গল্প শেষ হইলে ঘোষাল-গৃহিণীর পদধূলি লইয়া গাঁয়ে মাথায় মাখিবার ধুম পড়িয়া যাইত, কেহ কেহ সন্তানের মাথায় সেই ধূলি দিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত। কিন্তু ভিতরের কথা এই—শ্রীরাম ঘোষাল—ওরফে ছিরু ঘোষাল—ভয়ঙ্কর মাতাল ছিল। একবার কয়েক দিন জ্বরে ভুগিয়া হঠাৎ একদিন তাহার ফিট্ হয়। লোকে ভাবিল ছিরু মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু ডাক্তার আসিয়া আধ বোতল মদ খাওয়াইয়া দেওয়ায় মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া রোগী সুস্থ হইয়া উঠে। এই সামান্য ঘটনাটির উপর কল্পনাকুশলা ঘোষাল-গৃহিণী মরা স্বামী ফিরাইয়া আনিবার নারীমনোহর গল্পটি খাড়া করিয়াছিলেন। ক্রমে পল্লবিত হইয়া গল্পটি উক্ত আকার ধারণ করিয়াছিল। সতীর অদ্ভুতরসাত্মক গল্পের নিকট ডাক্তারের নীরস সত্য উক্তি নারী-সমাজে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। তাহার উপর স্বয়ং ঘোষাল মহাশয় যখন বলিলেন যে, তিনি যথার্থই যমালয়ে নীত হইয়াছিলেন এবং সেখানে রাজেন্দ্র মল্লিকের সন্দেশ রসগোল্লার হিমালয় ও ক্ষীরের প্রশান্ত মহাসাগর ও তারক পরামাণিকের মোহরের বিন্ধ্যাচল দেখিয়া আসিয়াছেন, তখন এই অকাট্য প্রমাণের কাছে অবিশ্বাসীদের সমস্ত যুক্তি তর্ক নিতান্ত অজ্ঞতাবিজৃম্ভিত প্রতীয়মান হইত।

এ হেন ঘোষাল ঠাকুরাণী যখন পারুলকে সতী মায়ের স্থানে যাইবার আদেশ করিলেন, তখন কে তাহার প্রতিবাদ করিবে? আর সতী মা জাগ্রৎ দেবতা; তাঁহার স্থানে যাইবার কথা উঠিলে, তাহাতে বাধা দিলে অমঙ্গল আছে।

* * * *

পারুল, দাদা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, পদধূলি লইয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, অনুমতি করুন, সতী মায়ের স্থানে যাইব।"

দাদা মহাশয় বিস্মিত নেত্রে পারুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পারুল বলিল, "কেন? জিজ্ঞাসা করিতেছেন? শ্বশুর-বাড়ীতে আর হাঁড়ী ঠেলিতে পারি না। যাহাতে আর হাঁড়ী ঠেলিতে না হয়, সে জন্য সতী মায়ের কাছে হত্যা দিব।"

দাদা মহাশয় সস্নেহে বলিলেন, "দিদি, তুমি সতী মায়ের কথা জান না, তাই এই মানস করিয়া সেখানে যাইতেছ।" আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পারুল বলিল, "কত লোক ত কত মানস করিয়া সতী মায়ের স্থানে যাইতেছে, দাদা মহাশয়? শৈলর স্বামীর অমন অসুখ ভাল হ'য়ে গেল!"

দাদা মহাশয় বলিলেন, "সতী মায়ের কথা শুনিবে?"

আমরা সকলেই আগ্রহ সহকারে বলিলাম, "শুনিব।" আমরা দাদা মহাশয়কে এরূপ ভাবে কথা বলিতে ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তাই অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি এই মর্ম্মে বলিতে লাগিলেন—

"এখন যেখানে সতী মায়ের মন্দির, বহুকাল পূর্ব্বে

সেখানে একটি ছোট মাটির ঘর ছিল। সেই ঘরে এক ব্রাহ্মণী বালবিধবা বাস করিত। তাহার নাম ছিল চাঁপা। বোধ হয় রূপ দেখিয়া বাপ মা ঐ নাম রাখিয়াছিলেন। তাহার তিন কুলে কেহ ছিল না। প্রবাদ—সে তাহার শ্বশুরের কিছু টাকা পাইয়াছিল, তাহা সে মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যখন বিধবা হয়, তখন তাহার বয়স সতর আঠার বৎসরের অধিক হইবে না। একে যুবতী, তাহাতে অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাহার উপর আবার ধনের গন্ধও আছে ; এমন অবস্থায় একাকিনী গৃহে বাস করায় নানা বিপদ জানিয়া সে তাহার এক আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু আত্মীয় তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া সে, ঘৃণায়, লজ্জায় সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া,গ্রামের জমিদারের বাটীতে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল। তাহার অনেক গুণের মধ্যে একটি গুণ এই ছিল যে, তেমন সুন্দর রাঁধিতে কেহ পারিত না। যে একবার তাহার রান্না খাইয়াছে, সে কখনও তাহা ভুলিতে পারিত না। কেবল যে সে সুন্দর রাঁধিতে পারিত তাহা নহে, চাঁপা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও ছিল। ময়লা, দুর্গন্ধ তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। এমন পরিষ্কার পবিত্রভাবে কাজ করিত যে, সকলেই তাহার হাতে খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিত। লোকের বাড়ীতে কাজ কর্ম্মে যাইয়া দিন রাত্রি রাঁধিয়া লোককে পরিতোষের সহিত খাওয়াইবে, ইহা-তেই তাহার অপার আনন্দ ছিল। একে অতি সচ্চরিত্র, তাহার উপর পাকা রাঁধুনি ; বহু দূর হইতে লোক আসিয়া চাঁপা ঠাকু-

রাণীকে সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে শ্রাদ্ধবিবাহাদি সমারোহ ব্যাপারে রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। পাড়ার লোকের ত কথাই নাই; ছোট বড় সকল কর্ম্মে চাঁপা ঠাকুরাণী না রাঁধিলে কাহারও খাইয়া তৃপ্তি হইত না। আর ব্রাহ্মণের মেয়ে কি খাটিতেই পারিত! রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া সকলের খাওয়া শেষ হইলে নিজে আহার করিত। এখনকার মত তখন সংসারে 'ঠাকুর' দেখা দেয় নাই। লোকে যা'র তা'র হাতে খাইত না। যে স্ত্রীলোকের হাতের রান্না সকলে না খাইত, হাজার ধন, হাজার রূপ থাকিলেও, সমাজে তাহার তাদৃশ সম্মান ছিল না।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইল। বৃদ্ধ জমিদার প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার যুবা পুত্রের একাধিপত্য হইল। সে অনেক দিন হইতেই চাঁপার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ছিল, বাপের ভয়ে পারে নাই; এবার তাহার সুযোগ হইল। শেষে একদিন চাঁপা ঠাকুরাণী পাষণ্ডের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিল।

চাঁপা ঠাকুরাণী ভাবিল, "যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। দেখিতেছি যত অনিষ্টের মূল এই রূপ, ইহাকে নির্ম্মূল করিতেছি।"

এই বলিয়া সে তাহার মেঘের মত কালো কেশের রাশি কাটিয়া ফেলিল এবং ব্রত উপবাসে শরীরকে কর্শিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাহার রূপের হাঁনি হইল না।

তাহার শরীরের জ্যোতি যেন আরও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে জ্যোতিতে কামুকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। সাধুর চিত্তে দেবতার ছবি ফুটিয়া উঠে। চাঁপা ঠাকুরাণী আপনার গৃহে ভগবান্‌কে রক্ষক করিয়া একাকিনী বাস করিতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ কাপুরুষ জমিদারপুত্র পদাঘাতের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। একদিন প্রাতঃকালে লোকে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, পুলিশ আসিয়া চাঁপাঠাকুরাণীর বাড়ী ঘেরিয়াছে। শুনা গেল সেই বাড়ীর মধ্যে চোর আছে। পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাগী চোর এক বাগ্দীকে ধরিয়া আনিল। সে সকলের সমক্ষে বলিল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি চুরির কিছুই জানি না। চাঁপাঠাকুরাণী আমাকে অনুগ্রহ করেন, আমি প্রত্যহ রাত্রে লুকাইয়া এখানে আসি।"

চাঁপা অশ্রুপূর্ণনেত্রে চীৎকার করিয়া বলিল, "ভগবান্ সাক্ষী, ধর্ম্ম সাক্ষী, এ মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

পুলিশ চোরকে লইয়া গেল। পাড়ায় চাঁপাঠাকুরাণীর চরিত্রের আলোচনার জন্য স্থানে স্থানে বৈঠক বসিয়া গেল। কেহ বলিল, "কথাটা মনে লাগে না।" অতি বিজ্ঞ মজুমদার মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রের কথা,—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং,
দেবা ন জানাতি কুতো মনিষ্যি।"

রায়গিন্নি বলিলেন—"মানুষ চেনা ভার। আমি কিন্তু বরা-

ববই ছুঁড়িকে সন্দেহ করতাম। মেয়ে মানুষ, তা'য় বিধবা, কিন্তু গায়ে একটু মলা বসতে দেয় না! চুল মুড়ান, ব্রত নিয়ম, ও কেবল লোকের চোখে ধুলা দেওয়া।" রামীর মা বলিল—"মাগী চিরকালই, বাপু, পুরুষ-ঘেঁসা। যেখানে লোকজনের মেলা সেই খানেই হাজির। আমরাও রাঁধিতে জানি, কিন্তু বেহায়ার মত অমন করিয়া পুরুষদের পরিবেশন করতে পারি নি।" পাকা রাঁধুনী বলিয়া রামীর মা'র কখনও সুযশ ছিল না। সে এই সুযোগে যতটুকু পারিল, চাপা ঠাকুরাণীর উদ্দেশে বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্গীরণ করিল। মিত্রজায়া বলিলেন—"না—না—তা' নয়, ছুঁড়ি প্রথমে ছিল ভাল, শেষে সামলাতে পারলে না। ওরই বা দোষ কি! মাথার উপর কেউ ত রক্ষক নাই।"

হায়, মিথ্যাপবাদ! তুমি ত্রেতা যুগ হইতে সমান ভাবেই প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আসিতেছ!

পাড়ার সকল কথাই চাঁপা ঠাকুরাণীর কাণে গেল। সে নিজের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "ভগবান্, তুমিও রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে! বিনা কলঙ্কে কলঙ্কিনী করিলে!"

সে ক্রোধে শাপ দিল, "যদি আমি বিনা দোষে দোষী হই, তবে যে আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতেছে, এক মাসের মধ্যে যেন তাহার সর্ব্বনাশ হয়।"

এক মাসের মধ্যে সে পাড়ায় কাহারও সর্ব্বনাশ হইল না। অতএব চাঁপার কলঙ্ক সম্বন্ধে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না।

*　*　*　*

বাঁড়ুয্যেদের বড় ছেলের বিবাহ। বড় ঘটার বিয়ে—মহা সমারোহ ব্যাপার। চাঁপা ঠাকুরাণী ভাবিল, "বাঁড়ুয্যেরা বাল্য কাল হইতেই আমাকে জানে। আমার মিথ্যা অপবাদের কথা তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে নাই। ছেলের বিবাহে রাঁধিবার জন্য নিশ্চয়ই ডাকিতে আসিবে।"

এ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া কাহাকেও খাওয়াইতে না পারায় চাঁপা ঠাকুরাণীর মর্মান্তিক কষ্ট হইতেছিল। কোথাও খুট করিয়া শব্দ হইলেই সে মনে করিতে লাগিল, বাঁড়ুয্যেরা ডাকিতে আসিতেছে। বেলা প্রায় এক প্রহর হইল—কেহই আসিল না। তখন সে কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "ভগবান্, সংসারে ঐ আমার একমাত্র সুখ—আমি এত পাপী, তাহাতেও আমাকে বঞ্চিত করিলে!" চাঁপা ঠাকুরাণী সে দিন সমস্ত দিনরাত্রি উপবাসে কাটাইল।

ভোলানাথ রায়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন। রায় মহাশয় মৃত্যুশয্যায় চাঁপা ঠাকুরাণীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"মা, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, আমার শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া নিজে রাঁধিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে; ব্রাহ্মণেরা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলে আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে।"

চাঁপা ঠাকুরাণী ভাবিল, "রায়-গিন্নি কি স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবে? নিশ্চয়ই আমাকে রাঁধিবার জন্য ডাকিতে আসিবে।"

কেহ আসিল না। পুত্র জননীকে বুঝাইল, "বাবার আজ্ঞা বটে, কিন্তু কুলটার হাতে খাইতে কে সম্মত হইবে?"

সম্মুখে দুর্গোৎসব। যখন ভিখারীরা পাড়ায় পাড়ায়—"ঐ পাষাণি, এলো তোর ঈশানী—" বলিয়া আগমনীর গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে চাপা বলিল, "মা ঈশানি—সতীকুলশিরোমণি—তুমি আসিয়া কি আমাকে নিষ্কলঙ্ক করিবে না মা!" চাপার আশা হইল, চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর দুর্গোৎসবে তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডাকিতে আসিবে; কিন্তু কেহ আসিল না। চাপা সেই দিন হইতে চক্ষু মুছিল, বলিল—"দেবতা মানুষেরই মত পাষাণ।"

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া পাড়ার একটি যুবক বলিল, "একটা দাগীচোর বাগ্দীর কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনারা চাপা ঠাকুরাণীকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পাড়ার এত জায়গায় নিমন্ত্রণ খাওয়া হইল, কোথাও খাইয়া তৃপ্তি হইল কি?"

একজন প্রৌঢ় বলিলেন, "কেদার ঠিকই বলিয়াছে। যখন চাপা ঠাকুরাণীকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তখন নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।"

নস্যসেবী বর্ষীয়ান্ ন্যায়রত্ন মহাশয় দন্তহীন তুণ্ডে একটা রোহিত মৎস্যের মুণ্ডকে কোনরূপে কায়দা করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "না হে না, তোমরা বুঝ না; কুলটা পরিহর্ত্তব্যা হস্তুলীবোরগক্ষতা।" সকলেই বলিল—"তা বটে।"

ক্রমে চাঁপা ঠাকুরাণীর অসহ্য বোধ হইল। সে রাঁধিয়া লোকজনকে না খাওয়াইতে পাইয়া পাগলের মত হইল। ভাবিল—"সত্য সত্যই কি পাগল হইয়া যাইব! ভাল, সৎ জাতি আমার হাতে না খায়, ভিখারীরা খাইবে। আমি নিজের গৃহে রাঁধিয়া ভিখারী ডাকিয়া খাওয়াইব।"

সে তাহাই করিতে লাগিল। শ্বশুরের যে কিছু টাকা পাইয়াছিল, তাহা খরচ করিয়া প্রত্যহ পাঁচ ছয় জনের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া অতিথি ফকিরকে ডাকিয়া খাওয়াইত। তাহাতেও পাড়ায় কত কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিল,"পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাইতেছে।" ইহা যে চাঁপা ঠাকুরাণীর পাপের ধন, এ বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। কেহ বলিল, "নষ্ট স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝে কাহার সাধ্য?"

* * * *

এই রূপে দিন, মাস, ক্রমে বৎসর শেষ হইতে চলিল। চাঁপা ঠাকুরাণী রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত রাত্রি দারুণ-জ্বর, তথাপি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া সে যথারীতি রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইত। নিজে কোন দিন উপবাসে, কোন দিন বা অতি সামান্য কিছু খাইয়া কাটাইত।

একদিন জমিদার-বাড়ীতে তাঁহাদের কুলগুরু আসিলেন। গুরুদেব বিশ্বনাথ সরস্বতী একজন পরম সাধক ও যোগী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায়

ভক্তি করিত। তাঁহার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তি ছিল। লোকের মুখ দেখিয়া তিনি তাহার অন্তরের কথা বলিতে পারিতেন। এক দিন জমিদার শিষ্যের সহিত চাঁপা ঠাকুরাণীর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী কয়েকজন অনাথকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতেছে। সেই রমণীর অপূর্ব্ব তেজোব্যঞ্জক বদনমণ্ডলে তিনি কি দেখিলেন জানি না, কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চাঁপা ঠাকুরাণী ইহার কিছুই জানে না। শিষ্য বিরক্ত হইয়া বলিল, "একটা কুলটার দিকে কি চাহিয়া রহিয়াছেন ?"

"কুলটা ! ইহাকে যে কুলটা বলে, আমি তাহার মুখ দর্শন করিতে চাহি না। ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী।"

শিষ্য হাসিয়া বলিল, "একটা বাগ্দী ছোঁড়াকে ইহার ঘরে আমরা ধরিয়াছি। সেই অবধি আমরা ইহাকে একঘরে করিয়াছি ; ইহার হাতে খাই না।"

বিশ্বনাথ সরস্বতী শিষ্যের মুখের প্রতি ক্ষণকালের জন্য তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহার হাতে খাও না, আমি খাইব—এখনই খাইব।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা, আমাকেও কিছু খাইতে দাও।"

চাঁপা ঠাকুরাণী যখন জমিদার বাটীতে থাকিত, তখন বিশ্বনাথ সরস্বতীকে দুই একবার দেখিয়াছিল। সেই তেজঃ-

পুঞ্জ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া চাঁপা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা. অভাগিনীকে সমাজ ত্যাগ করিয়াছে, তুমিও কি উপহাস করিতে আসিলে ?"

সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন, "না মা, উপহাস নয় ; তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ভগবতী ।"

পাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, স্বয়ং সরস্বতী ঠাকুর চাঁপা ঠাকুরাণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন খাইতেছেন। চাঁপা ঠাকুরাণীর উঠানে লোক ধরে না। আবালবৃদ্ধবনিতা উপস্থিত হইয়াছে। সরস্বতী ঠাকুর ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছেন—"আজ অন্নপূর্ণার হাতের অন্ন খাইয়া তৃপ্ত হইলাম।"

উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"অন্ধ তোমরা, হীরাকে কাচ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাও ত সতীকুলশিরোমণি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার প্রসাদ ভক্ষণ কর।"

সরস্বতী ঠাকুরের কথা লোকে বেদবাক্য বলিয়া মনে করিত। সকলে আগ্রহের সহিত কণা কণা করিয়া চাঁপা ঠাকুরাণীর হস্ত হইতে অন্ন লইয়া ভক্ষণ করিল।

সেই রাত্রেই চাঁপা ঠাকুরাণীর জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার মৃত্যু হইল। মরিবার সময় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মরণে আর আমার দুঃখ নাই, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত সকলকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিয়াছি।"

স্বয়ং সরস্বতী ঠাকুর মৃতদেহ বহন করিয়া সৎকারার্থে লইয়া চলিলেন। পশ্চাতে বিস্তর লোক চলিল।

জনতা জমিদার বাটীর কাছে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

যুবা জমিদার বিস্তর টাকা দেনা করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে গোপনে গৃহে নোট জাল করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ সন্ধান পাইয়া রাত্রে বাড়ী ঘেরাও করে। জমিদার তাহা জানিতে পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। পুলিশ লাশ আটক করিয়াছে। তাহার নিকট একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সে স্বহস্তে লিখিয়াছে—"চাপা ঠাকুরাণীর মিথ্যা অপবাদের প্রায়শ্চিত্ত হইল। সতীর পদধূলি আমার মাথায় দিও।"

লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সকলেই চাঁপা ঠাকুরাণীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার চিতার ভস্ম ঘরে লইয়া গেল।

সরস্বতী ঠাকুর নিজ ব্যয়ে চাঁপা ঠাকুরাণীর গৃহের উঠানে এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, এবং সেই দেবীর নাম দিলেন—সতী মা। এমন বন্দোবস্ত আছে যে, সতী মায়ের মন্দিরে আসিয়া কেহ অভুক্ত থাকিবে না।"

গল্প শুনিয়া আমাদের রোমাঞ্চ হইল। দাদা মহাশয় বলিলেন—"তাই বলিতেছিলাম, পারুল, তুমি যে মানস করিয়া

যাইতেছ, সতী মা কি তাহা পূর্ণ করিবেন? যাহা হউক, যখন যাইবে স্থির করিয়াছ, তখন যাও।"

*　　*　　*　　*　　*

সপ্তাহ শেষ না হইতেই সংবাদ আসিল যে পারুলের শ্বশুর প্রিভিকাউন্সিলের মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। পারুল কালবিলম্ব না করিয়া শ্বশুরবাড়ী গেল। দেখিল, শাশুড়ীও অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন।

শাশুড়ী শ্বশুরকে বলিলেন, "আজই ঝি চাকর ও রাঁধুনির বন্দোবস্ত কর। সোনার বাছাকে আমি আর আগুনতাতে যেতে দিব না।"

পারুল বলিল—"না, মা, ঝি চাকর সব রাখ, কিন্তু রাঁধুনি রাখিতে পারিবে না। যত দিন বাঁচিব ততদিন আমিই রাঁধিব।"

সকলে বিস্মিত হইল—এ কি কথা!

পারুল বলিল—"আমি সতীমায়ের কাছে চাহিয়াছিলাম, তিনি যেন তোমাদের পূর্ব্বের লক্ষ্মীকে আবার আনিয়া দেন, আর আমি যেন সতীমায়েরই মত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বহস্তে রাঁধিয়া লোকজনকে পরিতোষের সহিত খাওয়াইয়া মরিতে পারি। সতী মা আমার প্রথম বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, শেষটিও পূর্ণ করিবেন।"

পূজার খরচ

১

আশ্বিন মাস—পূজার মাস। বাঙ্গালীর সব গিয়াছে—পূজাপার্ব্বণ গিয়াছে, শ্রদ্ধা-ভক্তি গিয়াছে—তথাপি এই আশ্বিন মাস আসিলে জীবন্মৃত বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতরও যেন কি একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া যায়—হৃদয়তন্ত্রী কি এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠে। কৈলাসে, যেন নিদ্রাভঙ্গে, বঙ্গজননী মহামায়ার প্রাণ সন্তানের জন্য কাঁদিয়া উঠে—স্তনে পীযূষধারা ছুটিতে থাকে, তাই কি সন্তানেরও প্রাণ মায়ের জন্য ব্যাকুল

অনেক গান শুনিয়া থাকি, কিন্তু শরতের প্রভাতে আগমনী গানের মত কোন গানই মধুর লাগে না। ভিখারী বেহালা বাজাইতে বাজাইতে গাহিতেছিল—

গিরিরাজকে ডেকে দেগো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে
না ডাকিতে আমার ঘরে,
কেবা কবে এসেছিল॥

কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে
গিরিপুরবাসিগণে,
গিরিপুর আজ পুরে গেল ॥

ছোট সামান্য গান—কিন্তু এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই। যোগেশ একমনে গীত শ্রবণ করিল। শত কার্য্যের মধ্যেও সমস্ত দিন এই গানটি তাহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

* * * *

সে দিন অপরাহ্নে যোগেশের কলিকাতার বাসায় তুমুল তর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষে যোগেশ, অন্য পক্ষে যোগেশের স্ত্রী প্রভাবতী ও কনিষ্ঠ সহোদর রমেশ। যোগেশ বলিল—'পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে বাটীতে পূজা চলিয়া আসিতেছে, মাঝে কয়েক বৎসর অবস্থা হীন হওয়ায় বন্ধ হইয়াছিল। এখন যা' হ'ক মায়ের কৃপায় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং মা'কে আবার আনা উচিত নয় কি?'

রমেশ বলিল—'আমার ত উচিত মনে হয় না, দাদা। পূজা পার্ব্বণে অতিরিক্ত খরচেই ত আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। বাস্তু ভিটাটুকু ছাড়া যা' কিছু ছিল, সমস্তই গিয়াছে। ওকালতীতে তোমার এই দশার আরম্ভ হইয়াছে। এখন একটু চাপিয়া না চলিলে অবস্থা ফিরিবে না।'

প্রভাবতী দেবরের কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিল—

'আমিও ঠিক ঐ কথাই বলি। আজ উপায় হইতেছে, কা'ল যদি পড়িয়া থাক, তাহা হইলে সকলকে অন্ধকার দেখিতে হইবে। যখন এমন অবস্থা হইবে যে, ঘরে বসিয়া থাকিলেও সংসার অচল হইবে না, পূজাও বন্ধ করিতে হইবে না, তখন পূজা আরম্ভ করাই ভাল।'

যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'দেখ, আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এত অভাবের সৃষ্টি করিয়া ব্যয়বাহুল্য করিয়া বসি যে, আমার মত লোকের সে অবস্থা কখনও হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না; সুতরাং মা'কে আনাও আর হইবে না।'

প্রভাবতী ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'কেন, তোমার সংসারে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি এতই অন্যায় খরচ হচ্ছে?'

যোগেশ বলিল—'সে কথা বলিলে আমার নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা হইবে। আমি কি জানি না, তুমি বড় লোকের মেয়ে হইয়াও, এই বার তের বৎসর, সহাস্যমুখে সংসারের সমস্ত দৈন্য-দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া আমাদের এই নিরাশ্রয় ভাই দুইটীকে কি অশান্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছ? তোমার ন্যায় সুগৃহিণীর হাতে অপব্যয় অসম্ভব।'

রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—'বাস্তবিক, বৌদি,' তুমি না থাকলে আমাদের কি দশাই হ'ত! তোমার তের বছর বয়সে মা' তোমার হাতে সংসারের ভার দিয়ে চ'লে যান, তুমি সেই অবধি কি কষ্টেই—'

প্রভাবতী ঈষৎ হাসিয়া দেবরকে বাধা দিয়া বলিল—

'হাঁ, আমি ছিলাম বলিয়াই তোমরা রাজপদ পাইয়াছ, না থাকিলে—'

রমেশ বলিল—'না থাকিলে আমাদের অনন্ত দুর্গতি হ'ত বৌদি,' তাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমার চারি বৎসর বয়স থেকে তুমি আমাকে মানুষ ক'রেছ, বৌদি। আমার মত দুষ্ট ছেলেকে মানুষ করা সে কি কষ্ট তা' কি সব ভুলে গেলে?'

প্রভাবতীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সস্নেহে দেবরকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আর আমার মারগুলাও বুঝি ভুলে গেলি রমু!'

এমন সময় যোগেশের কনিষ্ঠা কন্যা শিবানী ছুটিয়া আসিয়া কাকার পিঠের উপর উঠিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তিন বৎসরের মেয়েটি—অরুণ-রাগরঞ্জিত একটি ক্ষুদ্র নদী-তরঙ্গের ন্যায় যোগেশের ক্ষুদ্র বাসাটিকে উজ্জ্বল ও আনন্দ-চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল। শিবানী অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া ক্রন্দনের সুরে বলিল—'কাকা, দাদা দিদি আমায় মেলেচে, ওদের বে দিও না।'

রমেশ তাহাকে কোলে লইয়া তাহার চক্ষু মুছিয়া দিল ও মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিল—'ওরা দুষ্টু ছেলে, ওদের আবার কে বে দেবে? আগে তোমার বে হ'ক্—' বলিয়াই দাদার দিকে চাহিয়া বলিল—'দেখ দেখি, তুমি পূজার জন্য এত টাকা খরচ করতে চাও, কিন্তু মেয়েদের বিবাহের

কি সংস্থান ক'রেছ ? বড়লোকের বাড়ীতে শিবানীর বে দিতে হ'বে।'

শিবানী পিতার কোলে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'হুঁ বাবা, বল বালীতে।'

যোগেশ কন্যার মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া বলিল—'তাই হবে, কিন্তু রমেশ, ওদের যখন বিবাহ হবে, তখন তুইও যে উপায় করবি। এক জনের উপায়ে সংসার চল্‌বে, পূজা পার্ব্বণ হবে, আর এক জনের উপায়ে সংস্থান হবে।'

প্রভাবতী বলিল—'সেই বেশ কথা। আর দু'বছরে বি এ, এক বছরে এম্ এ, আর এক বছরে ওকালতী পাশ। এই চা'র বছর তুমি অপেক্ষা কর, তার পর পূজার কথা হবে।'

যোগেশের মন কিন্তু এ কথায় আশ্বস্ত হইল না। মা'কে আনিবার জন্য তাহার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছিল। বহুদিন হইতেই তাহার এ সঙ্কল্প ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে সপ্তমীপূজার দিন শিবানী ভূমিষ্ঠ হয়। যোগেশ ইহাতে মা'য়ের ইঙ্গিত দেখিল। সেই দিন হইতে তাহার এই চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তখনও পৈতৃক পাঁচ ছয় হাজার টাকা দেনা শোধ করিতে বাকি ছিল। গত বৎসর তাহা শোধ হইয়াছে। এ বৎসর হাতে কিছু টাকাও জমিয়াছে। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল দেখিয়া, সে প্রকারান্তরে তাহা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল। রমেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'রমেশ, তোর কি দেশে যেতে ইচ্ছা হয় না রে?'

রমেশ বলিল—'না। চার পাচ বছর বয়স থেকেই কল্‌কেতায় আছি, দেশের জন্যে কখনও ত প্রাণ কাঁদে না দাদা। আর দেশে গেলেই ত জ্ঞাতি মহাশয়দের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। দেশ থেকে যাঁরা মধ্যে মধ্যে বাসায় এসে পায়ের ধূলা দেন, তাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখলে, কথাবার্ত্তা শুন্‌লে ত শ্রদ্ধার লেশমাত্র হয় না। তুমি আবার পুরাতন পৈতৃক বাড়ীটা মেরামত কর্‌তে অতগুলো টাকা খরচ কর্‌লে!'

প্রভাবতী বলিল—'শ্বশুরের ভিটে, বজায় রাখ্‌তে হবে। কিন্তু তা ব'লে আর দেশে বসবাস করা হবে না। এইখানেই একটি বাড়ীর চেষ্টা দেখ।'

যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'কিন্তু তোমরা যত সহজে ভুলিতে পারিবে, আমি তত সহজে ভুলিতে পারিব না! দেশের প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক বাগান, প্রত্যেক পুষ্করিণী, প্রত্যেক বৃক্ষের সহিত আমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত। সে দিন রাখাল খুড়ো বল্‌লে, দীঘির পাড়ের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটা রায়েরা কাটিয়েছে। শুনে আমার যেন চোখে জল এল। ঐ গাছের তলায় প্রত্যহ বৈকালে আমাদের ছেলের হাট বস্‌ত। যে দিন হনুমান্ এসে ঐ গাছে উঠ্‌ত, সে দিন যে আমাদের কত আমোদ হ'ত, তা আর কি ব'ল্‌ব। চক্রবর্ত্তীদের কালীর এমন সাহস ছিল যে সে গাছে উঠে হনুমান্‌কে তাড়া ক'র্‌ত। আহা, বেচারী আজ দারুণ ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। গুরুমশাই মরে গেছেন, তাঁর

ছেলে পাঠশালাটি নিয়ে আছে , বেচারীর অবস্থা বড় খারাপ। সে দিন আমাকে এক চিঠি লিখেছে, কিছু কিছু মাসিক সাহায্যের জন্য। ঘোষেদের পাকা প্রাচীব আমাদের ঘড়ী ছিল। দেওয়ালের কোথায় কখন রোদ এলে ক'টা বাজত, তা আমরা দাগ কেটে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। সে দিন দেখে এলুম, আমার সেই ছুরির দাগ এখনও ঠিক আছে। আহা আমারও যদি মনের দাগ সেই রকম ঠিক থাক্‌ত! মন্দিরতলায় সয়লার দিন কত আমোদ! বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে আমাদের কি আহার নিদ্রা থাক্‌ত?—বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। গ্রামে আমাদের বাড়ীতেই পূজা হ'ত। পূজার তিন দিন গ্রামে কারও বাড়ীতে হাড়ি চ'ড়্‌ত না। কোমরে গামছা বেঁধে থাল থাল অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করার সে কি আনন্দ ছিল। বাবা ইতর ভদ্র প্রত্যেকের কাছে গলায় কাপড় দিয়ে জোড় হাত ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন—পাছে কোন ত্রুটি হয়। লোকের খেয়ে কি তৃপ্তি—কি আনন্দ! সে দিন মোড়ল জ্যাঠা দুঃখ ক'রে বল্‌লে, 'বাবা, তোমাদেরও পূজা গেছে, আমারও খাওয়া গেছে!' আমি বাজার থেকে দেড় সের মনোহরা এনে বৃদ্ধকে খাওয়ালাম, এত বয়সে, এত দারিদ্র্য কষ্টেও তাহার সে আহারের শক্তি তেমনই আছে! খেয়ে কত আশীর্ব্বাদ! আমারও মনে হ'ল, রমেশ, তোকে খাওয়াইয়াও বোধ হয় আমার তত আনন্দ হয় না। এখন রায়েরা পূজা করতে আরম্ভ ক'রেছে বটে, কিন্তু শুনি, তাদের এমনি অহঙ্কার,

বড়মানুষি চা'ল ও অশ্রদ্ধার ভাব যে, তাদের বাড়ীতে মা'র প্রসাদ পেতেও অনেকে ইচ্ছা করে না।'

যোগেশ অতীত স্মৃতির উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হইয়া শরতের শুভ্র আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

২

এমন সময় নীচে সহস্র করতালের শব্দকে ধিক্কার দিয়া যতন দাসীর গলা বাজিয়া উঠিল। প্রথমে সকলেই চমকিয়া উঠিল; কিন্তু তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া কেহ কারণানুসন্ধানে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না।

যতন দাসী অসুরের মত খাটিতে পারিত, আবার অসুরের মতই কলহ করিতে পারিত। যে দিন কলহের কোনও কারণ না পাইত, সে দিন 'মুখপোড়া কাক' বা 'হতভাগীদের বেরাল'কে উপলক্ষ্য করিয়া দুই এক ঘণ্টা কাল বেশ এক তরফা কলহ চালাইত। এ সংসারে তাহার একমাত্র দুঃখ যে, সে কলহের কারণ খুঁজিয়া পায় না। যেমন কর্ত্তা, তেমনই গৃহিণী, তেমনই ছোট বাবু, আর তেমনই কি ছেলেমেয়েগুলা! সকলের মুখে যেন হাসি লাগিয়া আছে! তাহার কলহে কেহ যোগ দেয় না। গৃহিণী প্রথম প্রথম দুই এক কথা বলিতেন, কিন্তু এখন আর তাহাও বলেন না। এমন অবস্থায় একতরফা ঝগড়া কতক্ষণ চালান যায়? পূর্ব্বে যে ঠাকুরটা ছিল, সেটা বরং ছিল

ভাল—কথার জবাব করিত। এই নূতন ঠাকুরটির মুখে সাত চড়ে কথা নাই! এ কি কম দুঃখ!

আজ সে ঠাকুরের এক ত্রুটি পাইয়াছে। ঠাকুর সংসারের সাবানে নিজের কাপড় কাচিতেছে। যতন দাসী দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া গেল। বলিল—বাবুরা না হয় চোখ কাণ দেন না, তারা বড় লোক; বড় লোক হ'লে এমনি ক'রেই টাকা পয়সা নষ্ট করতে হয়। তা আমরা দাসী বাঁদী, আমাদের তাতে নজর দিয়ে কি হবে? খাটতে এসেছি, খেটে যাব; গরীব দুঃখীর কথায় কি বড়লোকে কাণ দেয়? কিন্তু তোমার কি আক্কেল বল দেখি, ঠাকুর! আজ ক' মাস এয়েছ, এক কাপড়ে আর এক গামছায় চালাচ্ছ। মনীবের কাছ থেকে গামছা কাপড় পাওনা গণ্ডা বুঝে নিলে, কিন্তু ছেঁড়া টেনা ঘুচ্‌লো না। তাই না হয় হ'ল, কিন্তু নিজের গাঁটের একটি পয়সা খরচ ক'রে সাবান পর্য্যন্ত কিন্‌তে পার না! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার, মনীবের সাবানে হাত দাও?

যতন ভাবিল, ঠাকুর এবার একটা উত্তর করিবে। কিন্তু সে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে সাবানটি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল।

যতন বলিল—'ছোঁড়ার দেমাক দেখ—যেন কত বড় মানুষ! দাসী বাঁদীর কথার একটা জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ল না! বলি, এত অহঙ্কার কিসের? আমার মত তোরও ত দেশে ভাত নেই ব'লে গতর খাটিয়ে খেতে এয়েছিস্!'

যাহারা জীবনে স্বয়ং অন্নকষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহারা পরের অন্নকষ্টের ব্যথা বুঝিতে পারে। তাই যতন অন্নকষ্টের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করায় ঠাকুরের মনে কত ব্যথা লাগিয়াছে ভাবিয়া, যোগেশ প্রভাবতীকে বলিল—'যতনকে ঝগড়া করতে নিষেধ করলে হয় না?'

প্রভাবতী উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া, ঠাকুরকে বলিল, 'ঠাকুর, দোকান থেকে ছেলেদের খাবার নিয়ে এস ত।'

ঠাকুর চলিয়া গেল; এ অপমান যতনের সহ্য হইল না। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—'বাবাগো! মাগো! আমায় তোমরা নাও গো! পেটের জ্বালায় কত অপমান সহ্য করতে হয় গো!'

যথাক্রমে উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্ত স্বরে মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া পরিশেষে যতন থামিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

৩

কথাটা ঠিক। বামুন ঠাকুর নিজে যার-পর-নাই কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিয়া পরিধানের কাপড়খানি পর্য্যন্ত দেশে পাঠাইয়া দেয়, অথচ বলে, তাহার কেহ নাই। ইহার কারণ কি? রাত্রে খাইতে বসিয়া রমেশ এই কথাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যোগেশ পাশের ঘরে বসিয়া মক্কেলের কাগজ-পত্র দেখিতেছিল। কথাটা শুনিয়া সে কাজ ফেলিয়া সেই দিকেই কাণ পাতিয়া রহিল।

ঠাকুর বলিল—'টাকা পাঠাই আমার জ্ঞাতি দাদাকে।'

'কেন ?'

'বাবা তাহার নিকট দেনা রাখিয়া গিয়াছেন।'

'কত টাকা ?'

'এখন একশ পঁচিশ টাকা নয় আনা।'

'তোমাদের কিছু জমী জমা নাই ?'

'না, বাবা গুরুমহাশয়গিরি করিতেন।'

'তাতে সংসার চল্‌ত না ?'

'কষ্টে সৃষ্টে চল্‌ত।'

'তবে এত দেনা কেন ?'

'আজ্ঞে, আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন—পৈতৃক ঠাকুর আছেন ; প্রত্যহ তাঁহাদের ভোগ হয়, এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। গত বৎসর যখন আমরা পৃথক্ হই, তখন সরকারী ঠাকুরঘর মেরামতের খরচ অর্দ্ধেক আমাদের অংশে পড়ে। সে প্রায় দেড়শ' টাকা ; বাবার হাতে এক পয়সা ছিল না। তার উপর তাঁর বড় অসুখ। তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ কর্‌ব বলেন। তাহাতে জ্ঞাতিরা অসম্মত হয় ; ঠাকুরের ভাগ আমাদের দিলে না। বল্‌লে, টাকা না দিলে ঠাকুরের ভাগ পাবে না।'

'বেশত, ভাগ নাই বা দিলে, তারাই পূজা করুক ; তোমরা ত একটা দায় এড়ালে।'

ঠাকুর বিস্মিতনেত্রে ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিল। পরে মুখ নত করিয়া বলিল,—'সে কি ছোটবাবু! যে ভিটের

ঠাকুর রইলেন না, অতিথি-ব্রাহ্মণ ভোজন হ'ল না, সে ভিটেয় কি গৃহস্থ জল গ্রহণ করতে পারে? সে ভিটে যে শ্মশান। মানুষ হ'য়ে জন্মে কেবল শিয়াল কুকুরের মত নিজেরই পোড়া পেটের চিন্তা করব, ছোট বাবু?'

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। সে ব'লল—'পৃথক্ হবার ঠিক এক মাস পরে এই দুঃখেই বাবা মারা যান। তারই কয়েক দিন পরে মা মারা যান। মা মরবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেছেন—"বাবা! যেমন ক'রে পার, ঘরের ধনকে ঘরে এন।" তাঁরা যে কয় দিন বেঁচেছিলেন, ভিটেয় জলগ্রহণ করেন নি, জ্ঞাতিদের বাড়ীতে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগ হ'য়ে গেলে, আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে রেঁধে খেতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর আমিও ভিটে ছেড়েছি। লক্ষ্মী জনার্দ্দনকে আনতে পারি, ফিরে যাব, নইলে নয়।'

ঠাকুর নীরব হইল। রমেশ ও প্রভাবতী কোনও কথা ক'হল না। কিয়ৎকাল পরে রমেশ আচমন করিয়া বৌ দিদিকে সঙ্গে লইয়া যোগেশের গৃহে প্রবেশ করিল। যোগেশ বালিশে ঠেস্ দিয়া নিমীলিতনেত্রে ঠাকুরের কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় রমেশ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—'দাদা!'

যোগেশ উঠিয়া বসিল, বলিল—'কি রমু!'

'মা'কে আন।'

যোগেশ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমারও কি সেই মত?'

'হাঁ। আর আমার চুড়ি গড়াবার জন্যে যে টাকা আছে, তা থেকে একশ পঁচিশ টাকা নয় আনা ঠাকুরকে দাও। ইহা পূজার খরচের মধ্যেই ধরিতে হইবে।'

নিষ্করুণ বাঙ্গালী

বাঙ্গালীর উপর বিধাতার যতগুলি অভিসম্পাত আছে, তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, ঘুষ না দিয়া বাঙ্গালীর কোনও কার্য্য হইবার নহে। চাকরী করিতে হইলে ঘুষ দিতে হইবে; সাহেব সুবার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তাহাদের নন্দী ভৃঙ্গীদিগকে ঘুষ দিতে হইবে; কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে কেরাণীকে ঘুষ দিতে হইবে, হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসা করাইতে হইলে উত্তম, মধ্যম, অধম অনেক দেবতাকে ঘুসে তুষ্ট করিতে হয়; কলিকাতায় বিনা ঘুষে নাকি মড়া পোড়ান পর্য্যন্ত চলে না। সুতরাং প্রথমশ্রেণীর একখানি কামরা রিজার্ভ করিয়াও আমাকে যে রেলের গার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কুলীমজুরদিগকে পর্য্যন্ত কিছু কিছু ঘুষ বা বখ্‌সিস্‌ দিতে হইল, সে জন্য আমার কোনও দুঃখ হইল না। যতদিন বাঙ্গালী বাঁচিবে, ততদিন তাহাকে ঘুষ দিতে হইবে; মরিলেও যে সে এ দায় হইতে নিস্তার পাইবে, এমন মনে করিবার সাহসও আমার নাই। ঘুষ দিবার আজীবনব্যাপী বদ্ধমূল-সংস্কার কত জন্মের কর্ম্মফলে লোপ পাইবে, বা আদৌ লোপ পাইবে কি না,—এ কথা কে বলিতে পারে?

পূজার ছুটী। দলে দলে লোক ষ্টেশনে আসিতেছে। ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র—সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ঘোম্‌টা দিয়া ছেলে কোলে করিয়া অগ্রবর্ত্তী পুরুষদিগের অনুধাবন করিতেছে; পশ্চাতে রেলওয়ে-কুলী মাথায় এক মোট, হাতে এক মোট লইয়া চলিয়াছে। কোন গাড়ীতেই স্থান নাই, তথাপি সকলেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। এক গাড়ীতে প্রবেশ করিতে বাধা পাইয়া অন্য গাড়ীর দিকে ছুটিতেছে। কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই, আমরাই গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে মর্‌ছি, আপনি দোর খোল্‌বার জন্য ধাক্কা মার্‌ছেন!' কেহ বা উত্তরে বলিতেছে—'কেন আমরা কি ভাড়া দিই নাই?' কোথাও বচসা হইতে হইতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইতেছে। কোথাও গার্ডকে ডাকা হইতেছে। যেখানে গার্ড আসিয়া জোর করিয়া লোককে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছে, সেখানে নবপ্রবিষ্ট আরোহীরা বাধাপ্রদানকারীদিগকে বলিতেছে—'কেমন, এখন হ'ল ত! লালমুখের গুঁতো না হ'লে হয় না!' যেখানে গার্ড প্রবেশ করিতে দিল না, সেখানেও অন্য পক্ষের ঐ একই জয়গর্ব্বোক্তি। একখানি ইণ্টার ক্লাসের স্ত্রীলোকের কামরায় চুণাগলির এক জন আধফরসা 'সাহেব' 'মেমসাহেব'কে লইয়া বসিয়া আছেন। কামরায় আর কেহ নাই। কিন্তু সে দিকে কি গার্ড কি আরোহীরা কেহই যাইতেছে না। 'নেটীভ' স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুই তিনখানি

মাত্র গাড়ী। তাহার ভিতর অপোগণ্ড, কিশোরী যুবতী, প্রৌঢ়া, বর্ষীয়সী,—সকল বয়সের,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের,—বাঙ্গালী, বেহারী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রি প্রভৃতি সকল জাতির, শিশু ও স্ত্রীলোক, বাঙ্গালীর সুসজ্জিত লাইব্রেরীর পুস্তকাবলীর ন্যায়, কে কাহার ঘাড়ে বসিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। একটিকে টানিয়া বাহির করিতে হইলে অপরগুলি স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়িবে। এক মুঙ্গের-মোহিনী তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে এক বাঙ্গালী রমণীর মুখের দিকে ধূম পরিত্যাগ করিল। রমণী মুখে কাপড় দিয়া বলিল—'আঃ মরণ, লজ্জা করে না, মাগী তামাক খাচ্ছে দেখ!' কিন্তু তাহার কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কাঁসার বালার বহর দেখিয়া আর অধিক কথা বলিতে সাহস করিল না।

পান, বিড়ী, 'হট্টির' সরবরাহ খুব চলিতেছে। কাগজ-ওয়ালারা 'ষ্টেশম্যান 'ডেলিনুজ,' 'বাঙ্গালী' করিয়া হাঁকিতেছে। পনর-আনা-এক-আনা-চুল-ছাঁটা, চোখে-চশমা, হাতে-ছড়ি, মুখে-চুরুট ছোকরা বাবুরা গাড়ীর মধ্যে স্ব স্ব স্থান সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়া, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মেয়ে কামরাগুলির সম্মুখে পাদচারণা করিতেছে; তাহাদের বিশ্বাস মেয়েরা—অন্ততঃ তাহাদের স্বজাতীয়া বাঙ্গালী রমণীরা—তাহাদের সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তারিফ করিতেছে। বাবুদের কেহ কেহ হয়ত জননীর অহোরাত্রপরিশ্রম-লব্ধ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন।

এক-দুই-তিন—ঘণ্টা বাজিল। ট্রেন একবার তীব্র চীৎকার করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

২

ব্যাগ হইতে সংবাদপত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক জন বাঙ্গালী সম্পাদক লিখিয়াছেন—'পূজার ছুটিতে বাঙ্গালী বাবুরা নানা স্থানে ফুর্ত্তি করিবার জন্য চলিয়াছেন, বাড়ীতে হতভাগিনী রমণীরা রহিল—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গোসেবা আর ঠাকুরপূজা করিবার জন্য! এমন স্বার্থপর নিষ্করুণ জাতির আবার উন্নতি!'

স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইলাম। স্ত্রী বলিলেন—'লেখকের অন্যায় কথা। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া গেলে, তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিতেন। এই গাড়ীতে যে এত বাঙ্গালী ভদ্র-লোক চলিয়াছেন, ইঁহাদের সকলের অবস্থা ত ভাল বোধ হইল না, কিন্তু অনেকেই ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে লইয়াই চলিয়াছেন। তবে যাহাদের অবস্থায় একেবারে কুলায় না, তাঁহারা কি করি-বেন? স্ত্রীলোকদিগকে একাকী পাঠান যায় না; কাজেই নিজেরা বাহির হইয়াছেন। সমস্ত বৎসরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর দুই চারিদিনের জন্য একটু স্থানপরিবর্ত্তনও সহৃদয় সম্পাদক মহাশয়ের সহ্য হইল না! ইঁহাদের জীবনের উপর যে সমস্ত পরিবারের জীবন নির্ভর করিতেছে। ভগবান্ আজ আমা-দিগকে টাকা দিয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছায় আমরা এক-

দিন দরিদ্র হইয়া পড়ি, আর তোমাকে সাধারণ বাঙ্গালীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার সামান্য একটু গহনা থাকিলেও তাহা বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় তোমাকে জোর করিয়া এই ছুটিতে দু'দিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবার জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দিতাম।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিতাম না।'

স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তোমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিতাম। তুমি বাঁচিলে তবে ত আমরা।'

আমি বলিলাম—'সাহেবরা বলেন, আমরা বড় স্বার্থপর, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লই, কিন্তু তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আদৌ দৃষ্টি করি না। আপনারাই ভাল খাই, ভাল পরি, তাহারা না খাইতে পাইলেও ফিরিয়া দেখি না।'

'সাহেবরা বল্‌তে পারেন, তাঁরা আমাদের ঘরের খবর ত জানেন না। কিন্তু জেনে শুনে এদেশের লোকেরা ও কথা বলেন কি ক'রে? আমার 'সই' কে ত জান? তার স্বামী চাকরী করেন, বেশী মাইনে পান না, তার উপর তিন চারিটি ছেলে মেয়ে। সই বলে, "ভাই, তাঁকে ভাল জিনিস যা সামান্য কিছু খেতে দেওয়া হয় তা' থেকেও তিনি কিছু কিছু পাতে ফেলে রেখে যান। কত মাথার

দিব্য দিই, শুনেন না। বলেন—একে অভাবের সংসার, তায় শাশুড়ী নেই যে, বউকে দেখে শুনে খাওয়াবেন। তাই যা খেতে না পারি, পাতে ফেলে রেখে যাই। আমি বলি—কি পাগলের মত কথা কও আমি কি আমার জন্য না রেখে তোমাকে দিই? তা ভাই, লজ্জার কথা বল্‌তে কি, এক একদিন হাঁড়ি দেখিয়ে বিশ্বাস করাতে হয়।” আমরা হিন্দুর মেয়ে, লোককে খাওয়াতে আমাদের যে আনন্দ, নিজে খেয়ে সে আনন্দ হয় না। মা'কে দেখেছ ত—(শৈলবালা স্বর্গগতা শাশুড়ীর কথা উঠায় তাঁহাকে হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল)—সংসারে কারো খাবার কোনও অভাব নাই; তবু তিনি নিজে ভাল জিনিস খেতে পারতেন না; পাঁচ জনকে দিয়ে, সামান্য একটু যা' থাকৃত, তাই খেতেন।'

আমি বলিলাম 'তোমরা কিন্তু এ বিসয়ে বড় বাড়াবাড়ি কর। নিজের শরীরকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে সংসারের সেবায় মন দাও। প্রথমতঃ, ভগবান্ যে শরীর দিয়েছেন, সে শরীরকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য কর্‌বার অধিকার কারও নাই; দ্বিতীয়তঃ, নিজের শরীর নষ্ট হ'লে কেবলই কি নিজেরই গেল? সংসারের সকলেরই যে তায় কষ্ট ও অশান্তি।'

'শরীরকে অবহেলা করা খুব দোষ, তা' স্বীকার করি। যে ইচ্ছা ক'রে শরীরের অযত্ন করে, তার ভারি অন্যায়। কিন্তু অবস্থা অনুসারে বাধ্য হ'য়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে যেমন পুরুষকেও শরীর ক্ষয় কর্‌তে হয়, অনেক স্ত্রীলোককেও সেইরূপ

নিজের শরীর নষ্ট করতে হয়। তার উপায় কি? কিন্তু সকলেই কি শরীর নষ্ট করে? মাছের মুড়ো না খেলে কি শরীর রক্ষা হয় না! পুষ্টিকর খাবার পেট ভ'রে খেতে পেলেই হ'ল। ভাল মন্দ জিনিস শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, সন্তান, সকলের সঙ্গে সমান ভাগে খেতে হ'বে, এ লোভ যে হিন্দুর মেয়ের হবে, তা'র মরণই ভাল। তার পর পর্‌বার কথা। দেখতে ত পাই, যার স্বামী আধময়লা কাপড় প'রে ও ছেঁড়া পিরাণ গায় দিয়ে প্রত্যহ আপিস করে, তার স্ত্রীরও দুই একখানা গহনা আছে, দুই একখানা ভাল কাপড় আছে। স্বামী কতটা স্বার্থত্যাগ করলে এই গহনা কাপড় হয়, তা কি নিন্দুক মহাশয়েরা জানেন না? কোন কোন স্থানে বিপরীতও দেখা যায়, কিন্তু তা' নিয়ম নয়, ব্যভিচার। আর কোন্ দেশেই বা তা নাই?'

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'তুমি এ সব বল্‌ছ কি? হিন্দুরা যে স্ত্রীপীড়ক তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা এবং তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যেরা অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র বেছে বেছে পুরুষদের বেলা ভাল নিয়ম ক'রেছে, আর স্ত্রীলোকদিগকে অষ্টে পৃষ্ঠে নিয়মের কঠিন নিগড়ে বেঁধেছে। শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা একেবারেই নাই। মনু ব'লেছেন—"স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে, কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না।" এ কি কম অত্যাচারের কথা! সুসভ্য দেশে স্বামী স্ত্রী একই পদের জন্য

প্রার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। পুরুষদের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য বিলাতে রমণীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্য্যন্ত করিতেছে! আর আমাদের দেশে কি না—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি!'

গৃহিণী আমার কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া, আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, সমাজে এই ভাব প্রবল হ'লে দাম্পত্য সুখ থাকে কি?'

'নাই বা রইল, তাতে ক্ষতি কি?'

'নাই বা রইল! তুমি বল কি? দাম্পত্য-প্রেমে মানুষকে যত উদার, মহান্‌, স্বার্থত্যাগী করতে পারে, এমন আর কিছুতে পারে কি? গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূল এই দাম্পত্য-প্রেম, গার্হস্থ্য আশ্রমের উপরে অন্য সকল আশ্রমই যে প্রতিষ্ঠিত! এই উচ্চ বৃত্তিগুলি যদি এইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তবে মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় থাকিবে কি? তুমিইত বল, সাহেবেরা পর্য্যন্ত তাঁদের দেশের নারীদের নারীসুলভ গুণের ক্রমশঃ অভাব ও মাতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা দর্শনে অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছেন!'

'ও সব তোমার রামায়ণ-মহাভারত-পড়া সেকেলে বিদ্যার কথা। আমাদের দেশেই আজ কাল কেহ কেহ পাতিব্রত্যকে ঘোড়ার ডিম বলতে আরম্ভ ক'রেছেন।'

'ও কথা ছেড়ে দাও, উহা শুনলেও হিন্দুর মেয়ের পাপ হয়। অন্য জাতির কি আছে জানি না; কিন্তু তোমার

কাছে আমাদের বিবাহের মন্ত্রের যে অর্থ শুনেছি, তা' থেকে এই বুঝেছি যে, হিন্দু শাস্ত্র কখনও স্ত্রীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে না।* পাপ কথা ছেড়ে তোমার একটু পায়ের ধূলা দাও।'

*　　*　　*　　*

ভোরবেলা গাড়ী পুরী ষ্টেশনে পঁহুছিল। তখন যাত্রীদের নামিবার ও মালপত্র নামাইবার একটা মহাশব্দ আরম্ভ হইল। আবার ঘুষ দিবার পালা। কুলী কাহারও মাল টানিয়া তুলিয়া বলিল—'বাপ্ রে বাপ! ইয়া তিন মোন্‌সে জাস্তি হোগা।' 'সে কি বাপু।' হাবড়ায় যে ওজন ক'রে দিয়েছে।' 'হিঁয়া ফিন্ ওজন হোগা।' এই বলিয়া মাল লইয়া প্লাটফরমের এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল। 'তবে ওজন কর না বাপু!' 'তোমহারা নওয়াব কা মাফিক বাৎ হ্যায়। দো ঘণ্টা বাদ ওজন হোগা।' 'সে কি! আমাদের মেয়েরা যে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!'

---

* "ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥
ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

অনুবাদ—হে বধু, মণিতুল্য অন্নরূপ ফাঁদ দিয়া, রত্নতুল্য প্রাণরূপ সূত্র দিয়া, সত্যরূপ গ্রন্থি দিয়া (আমার হৃদয় ও মনের সহিত) তোমার হৃদয় ও মন এক সঙ্গেই বন্ধন করি।

তোমার এই যে হৃদয়, তাহাই আমার হৃদয়; এবং আমার এই যে হৃদয়, ইহাই তোমার হৃদয় (অর্থাৎ উভয়ের হৃদয় অভিন্ন হউক)।—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন-কৃত আহ্নিক-কৃত্যম্ ৪।৫ ভাগ।

কুলী কোনও উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। ভদ্রলোক কি করেন, আট আনা ঘুস দিতে স্বীকার করিলেন। শেষে দুই টাকায় রফা। টাকা দুইটি দিবামাত্র কুলী মোট লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল, ওজন করিল না। মোট নামাইয়া সে আবার হাত পাতিল। 'আবার কি?' 'মুটের ভাড়া?' ভদ্রলোক 'কি ঝকমারি!' বলিয়া চারিটি পয়সা দিলেন। কুলী তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল -'চার আনাসে এক পয়সা কম্‌তি নেহি।' আর কি হইবে, চারি আনাই দিতে হইল। একই মালের জন্য একদফা হাবড়ায় ঘুস, আর এক দফা পুরীতে। কোথাও টিকিট কলেক্টর ছেলের বয়স লইয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে—এ ছেলের আধা ভাড়া হইতেই পারে না। তাঁহাকেও প্রসন্ন করিতে হইল।

আমার চাকর গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা গাড়ী চড়িয়া আমার 'সাগরাবাসে'র অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

৩

সকাল সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে কি জনতা! স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকার মহামেলা! স্বামী পুত্রের বা কন্যার হাত ধরিয়া চলিয়াছেন, পার্শ্বে একটু ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী চলিয়াছেন; পশ্চাতে দাস বা দাসী শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়াছে। কোথাও বহুক্ষণব্যাপী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ বালুকার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। বালক-বালিকারা সমুদ্রের

দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ছুটাছুটি করিয়া নানা বর্ণের ঝিনুক কুড়াইতেছে। সমুদ্র গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে কূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, তাহার কি দুঃখ, সেই জানে! জেলেরা ভেলায় চড়িয়া উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যাইতেছে। ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আনি দুয়ানি প্রভৃতি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আর উলঙ্গ জালিক-বালকেরা জলে ডুবিয়া তাহা তুলিয়া আনিতেছে। আমরাও বেড়াইতেছিলাম। সাগর-কূলের এই দৃশ্যে আমরা অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিতেছিলাম।

সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি। আমার চারি বৎসরের কন্যা হেমা কখনও হাঁটিতেছে, কখনও বা চাকরের স্কন্ধে উঠিয়া যাইতেছে। আমার স্ত্রী বলিলেন—'আর কাজ নাই, চল ফিরিয়া যাই।' ফিরিলাম। কিয়দ্দূর আসিতে আসিতে দেখি, আমাদের সম্মুখে একটি পুরুষ ও একটি রমণী চলিয়াছেন। একটি বালক পুরুষটির হাত ধরিয়া চলিয়াছে; আর একটি শিশুকে তিনি ক্রোড়ে করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির বক্ষেও একটি শিশু, সে মাতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। আমাদের পদশব্দে স্ত্রীলোকটি একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তখনই মুখ ফিরাইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ! বয়স বাইশ তেইশের অধিক হইবে না, কিন্তু দেখিলে চল্লিশের

উপর বলিয়া মনে হয়। রমণী কঙ্কালসার দেহে অতিকষ্টে শিশুসন্তানটিকে বহন করিতেছেন।

দেখিয়া কষ্ট হইল। আমার স্ত্রী অতিমৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন—'হেমাকে আমি কোলে করিয়া লইতে পারি। গোবিন্দ উঁহার শিশুটিকে কোলে লইলে হয় না?'

আমি একটু চিন্তা করিয়া ভদ্রলোকটির নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলাম—'যদি কিছু মনে না করেন, একটি কথা বলি।' ভদ্রলোকটি বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি—বলুন না?'

আমি রমণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম—'উঁহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখিতেছি, শিশুটিকে লইয়া পথ চলিতে উঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, শিশুটিকে আমার চাকরের কোলে দেন।'

ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী সেই রমণীর পার্শ্বে গিয়া অস্ফুটস্বরে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন। রমণী দুই একবার ঘাড় নাড়িলেন—বোধ হয়, আমার স্ত্রীর প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী ছাড়িবার পাত্র নহেন! তিনি জোর করিয়া নিদ্রিত শিশুটিকে রমণীর বক্ষঃ হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজের বুকে শোয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। পুরুষটির চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাহাতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?'

'কলিকাতা হইতে?'

'কত দিন এখানে থাকিবেন?'

'মহাপ্রভুই জানেন।'

'কেন বলুন দেখি?'

'আমাদের অবস্থা ত দেখ্‌ছেন! বেশী দিন থাকিবার সঙ্গতি কোথা?'

'আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

'আমাদের কথা শুনিতে চান্?'

'যদি বাধা না থাকে'—

'আপনার ন্যায় ব্যক্তির নিকট বলিতে কোন বাধা নাই।'

পুরুষটি একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

'কি আর বলিব মহাশয়? অতি সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। সংসারে আমি আমার স্ত্রী ও এই তিনটি শিশু। দুঃখের সংসারে আমার স্ত্রীর গুণে দুঃখের জ্বালার অনেক লাঘব হইয়াছিল। প্রত্যহ অভাবের সহিত স্ত্রীকে কিরূপ সংগ্রাম করিতে হইত তাহা বুঝিতাম, বুঝিয়া অন্তরে যন্ত্রণা অনুভব করিতাম; কিন্তু একদিনও উঁহার মলিন মুখ দেখি নাই। উঁহার সুব্যবস্থায় কখনও আমাকে ঋণদায়ে পড়িতে হয় নাই। গত শ্রাবণ মাসে আমার বিষম পীড়া হয়। কয়েকদিন আমি সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলাম। আমার স্ত্রী তাঁহার গহনাপত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া আমার

চিকিৎসা করাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন। আমি বাঁচিলাম, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে ও অভাবে উঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। পাছে আমি উদ্বিগ্ন হই, এই জন্য যতদিন গোপন করা সম্ভব, শরীরের অবস্থা গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মাস দুই হইল উঁহার শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে। ডাক্তার পুরীতে আনিবার পরামর্শ দিলেন। হাতে একটি পয়সা নাই। স্ত্রীর একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও সকালে ছেলে পড়ান, দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত আফিসে চাকরী, আবার রাত্রে ছেলে পড়ান, এইরূপে—আর আফিসের দরোয়ানের নিকট হইতে ধার করিয়া, মোট একশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা হইতে রেলভাড়া গিয়াছে। আজ আট দিন হইল আসিয়াছি। এক পাণ্ডার বাড়ীতে আছি। একখানি ক্ষুদ্র কুঠারী, তাহারই ভাড়া প্রত্যহ বার আনা। জিনিস-পত্র ত অগ্নিমূল্য। শরীরের উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, এখন মহাপ্রভুর মনে যা' আছে, তাহাই হইবে।' বলিয়া ভদ্রলোকটি এমনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, 'কাজ ভাল করেন নাই। ইহা অপেক্ষা যদি কলিকাতার কাছাকাছি কোন পল্লীগ্রামে ফাঁকা জায়গায় রাখিয়া ঐ টাকায় আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা করাইতেন, তাহা হইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল। আপনারা কি কলিকাতার বাসিন্দা?'

'না, আমাদের দেশ কলিকাতা হইতে বড় বেশী দূর নহে।'

'সেখানে গেলেন না কেন? ম্যালেরিয়া আছে কি?'

'নাই একেবারে বলা যায় না, তবে সে ভয় তত বেশী নয়। চাকরী হবার পর থেকে কলিকাতাতেই আছি, দেশের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।'

'আমাদের ঐ দোষ। আমরা মুখে বাতাসকে প্রাণ বলি, কিন্তু সেই প্রাণের বিনিময়ে কলিকাতার কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই। আপনি কি বুঝেন, এখন আপনার স্ত্রীর প্রধান ঔষধ—বিশুদ্ধ বাতাস?'

'ডাক্তারও তাহাই বলিয়াছেন।'

'ভগবানের কৃপায় এযাত্রা যদি উনি রক্ষা পান, তাহা হইলে আবার গিয়া ত কলিকাতার অন্ধকূপে বাস করিবেন?'

ভদ্রলোকটি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পরে সজলনয়নে বলিলেন—'ভগবান্ যদি এ যাত্রা আমার স্ত্রীর প্রাণ-রক্ষা করেন, তাহাহইলে দেশেই আবার ফিরিয়া যাইব। কিন্তু সে আশা আমার নাই!'

তাঁহারা সমুদ্রতীর হইতে সহরের ভিতর দিকে চলিলেন। আমরা বিদায় লইলাম। তাঁহাদের নিষেধসত্ত্বেও গোবিন্দ শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহাদের বাসা পর্য্যন্ত চলিল।

আসিতে আসিতে স্ত্রীর নিকট ঐ কথাই শুনিলাম।

গোবিন্দের নিকট উঁহাদের বাসার যে বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যেন হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

স্ত্রী বলিলেন—'আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। এই পরিবারটিকে রক্ষা করিতে হইলে আজই উহাদিগকে উঠাইয়া এখানে আনা উচিত।'

* * * *

বিকাল বেলা গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসায় গেলাম। কি আবর্জ্জনা, কি দুর্গন্ধ! রোগীর কথা দূরে থাকুক, সুস্থ অবস্থায় যে কেহ সেখানে থাকিবে, তাহারও স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, গৃহস্বামীর সহিত সেই ভদ্রলোকটির বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে। শুনিয়া বুঝিলাম যে, আজ গত এক সপ্তাহের ভাড়া পাঁচ টাকা চারি আনা মিটাইয়া দিবার সময় গৃহস্বামী বলিল—প্রত্যহ এক টাকা হিসাবে দিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা ঐ কুঠারী-সংলগ্ন একটি অপ্রশস্ত দালানও ব্যবহার করিতেছেন। ভদ্রলোক বলিলেন—'দালান ত কুঠারীরই সামিল।' গৃহস্বামী বলিল—'না, এ সময় ঐ দালানেরই ভাড়া প্রত্যহ এক টাকা।' এইরূপে বাদবিতণ্ডা হইতে হইতে গৃহস্বামী অতি রুক্ষভাবে বলিল—'পয়সা নেই ত পুরীতে হাওয়া খেতে আস্‌বার বড়মানুষী কেন? আজ শুদ্ধ আট দিনের আট টাকা ভাড়া দিয়ে এখনই উঠে যাও।'

রমণী ক্ষীণস্বরে স্বামীকে বলিলেন—'তাই কর, চল আজই রাত্রের গাড়ীতে কল্‌কাতায় যাই। তোমাকে বার

বার বারণ কর্‌লুম এখানে আস্‌তে, তুমি ত শুন্‌লে না! সকলে না এসে তুমি একেলা এলে বরং তোমার শরীর কিছু ভাল হ'ত।'

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'মহা-প্রভুর যখন তাই ইচ্ছা, তখন চল বাড়ীই যাওয়া যাক্। সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাব, তার বন্দোবস্ত করি।' বলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলেটিও আসিল। সে পিতাকে বলিল—'বাবা, এদের বাসা ছেড়ে দিয়ে চল না আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাসা করি। কেমন সব সুন্দর বাড়ী!'

পিতা কোন উত্তর করিলেন না, অন্য দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিলেন।

আমি অগ্রসর হইয়া খোকার হাত ধরিয়া বলিলাম—'চল খোকা, সমুদ্রের ধারেই তোমাদের জন্য বাসা ঠিক করা আছে।'

ভদ্রলোক এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পান নাই; এখন দেখিয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বলিলেন—'আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন, মহাশয়! আমার স্ত্রীর নিকট আপনার স্ত্রীর কথা শুনে তাঁকে দেবী বল্‌তে ইচ্ছা করে। মনে ক'রেছিলাম, যাবার পূর্ব্বে আর একদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব। কিন্তু তা' আর হ'ল না। আমরা আজই চললাম।'

'তা' আমরা বাহির হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি আপনার স্ত্রীকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি। যতদিন তিনি সুস্থ না হ'ন্, ততদিন সমুদ্রতীরে আমার বাড়ীতেই আপনারা থাকিবেন। আমার স্ত্রীরও ইহা একান্ত অনুরোধ।'

খোকা আনন্দে নাচিয়া উঠিল! সে কালবিলম্ব না করিয়া মাকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়া গেল। ভদ্রলোক কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ একখানি গাড়ী আনিয়া হাজির করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমার 'সাগরাবাসে' উপস্থিত হইলেন।

আমার সহোদরা ছিল না। কিন্তু সে বৎসর হইতে আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সহোদরার অভাব অনুভব করি নাই। প্রতি বৎসর, একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, একটি উদার উন্মুক্ত হাস্যমুখর ভবনে, একটি প্রীতিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়, একান্ত আগ্রহে, আমার জন্য 'যমের দুয়ারে কাঁটা' দিয়া থাকে।

পাষাণীর মাঠ

১

যে গ্রামে রাধানাথের মাতুলালয় সে গ্রামের নাম পাষাণীর মাঠ। এই নামের সহিত একটি কিংবদন্তী জড়িত আছে। গ্রামখানির আকৃতি একটি অতিকায় কূর্ম্মের পৃষ্ঠের মত। গ্রামের পরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—শস্যের চিহ্নমাত্র নাই—যেন একখানা পাষাণ পড়িয়া আছে। লোকে কত চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শস্য দূরের কথা, দুই মুষ্টি ঘাসও সে মাঠে কখনও উৎপন্ন করিতে পারে নাই। গ্রামখানির স্থানে স্থানে লক্ষ্য করিলে অতি প্রাচীন অট্টালিকা প্রভৃতির চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলে বোধ হয়, কোন সুদূর অতীত কালে ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অজ্ঞ গ্রামবাসীরা বলিত—এই দেশের প্রাচীন রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন—সীতারাম। এই মাঠের উপস্বত্ব হইতেই সীতারামের সেবা হইত! সে সেবা সামান্য ব্যাপার নহে। প্রত্যহ শত শত ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে ভোজন করান হইত। প্রত্যেক বৎসর শ্রীরাম নবমীর দিন প্রকাণ্ড মেলা বসিত। সাত আট দিন ধরিয়া সে মেলা থাকিত। কত দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিত, কাহাকেও রাঁধিয়া খাইতে হইত না, সকলেই সীতারামের ভোগ

পাইত। যে মাঠের আয় হইতে এরূপ ব্যাপার চলিত, আজ সেই মাঠে একটি গাভীর আহারও মিলে না! কালে এই বংশের একজন রাজা ঘোরতর শৈব হইয়াছিলেন, তিনি সীতারামের মূর্ত্তি ফেলিয়া দিয়া সেই মন্দিরে হরগৌরীর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু এই ভেদবুদ্ধির জন্য গৌরী অত্যন্ত রুষ্ট হন। রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। একদিন রাত্রে রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সমস্ত পাতালে চলিয়া যায়। তদবধি এই মাঠ অভিশপ্ত হইয়াছে এবং ইহার নাম হইতে গ্রামেরও নাম হইয়াছে পাষাণীর মাঠ।

গ্রামবাসীদের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল—

আস্‌বে রাম, আন্‌বে সীতা,
সাগর পারের জুট্‌বে মিতা,
তুষ্ট হবেন ঈশানী,
হাস্‌বে তবে পাষাণী।

কিন্তু পাষাণীর মাঠ আবার হরিৎ শস্যসম্ভারে হাসিবে, এ আশা আর কেহ করে না।

গ্রামবাসীরা অতি দরিদ্র। পাষাণীর মাঠ ছাড়া গ্রামের অন্য দিকে সকলেরই কিছু কিছু জমি ছিল, চাষবাস করিয়া তাহারা অতি কষ্টে সংসার চালাইত। তাহাদের প্রতিও বোধ হয় বিধাতার অভিশাপ ছিল; কেন না এত কষ্ট সহ্য করিলেও, তাহারা স্থানান্তরে যাইয়া ভাগ্যপরিবর্ত্তনের কোন প্রকার চেষ্টা করিত না।

যে দিন রাধানাথ বি এ পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে মাতুলালয়ে আসিল, সে দিন নিরক্ষর গ্রামবাসীরা তাহাকে যে কি ভাবিল, তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কেহ বলিল, সরস্বতীর বরপুত্র; কেহ বলিল, শ্রীরাম গাঙ্গুলীর কপাল ফিরিয়াছে, অনাথ ভাগিনেয়কে মানুষ করিয়া এবার ক্রোরপতি হইবে। গ্রামবাসিনীরা বলিলেন—"রূপে গুণে এমন ছেলে কখনও কারও কোথাও হয় নাই, হবেও না। এবার মুলুকের লাটসাহেব রাধুকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে, বিবি বে দিয়ে, দারোগা ক'রে দেবে।" সেই ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামের বিশ ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে "তিন—তিনটা পাশ" কেহ পাইয়াছে ব'লিয়া গ্রামবাসীরা জানে না। তিন তিনটা পাশ যে কি জিনিশ সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতীব অস্পষ্ট। তবে তাহা যে এক অপূর্ব্ব পদার্থ—দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত ধন—কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা—এইরূপ একটা ধারণা তাহাদের ছিল। গ্রামের মধ্যে প্রধান ও পণ্ডিত ব্যক্তি রামধন চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রথম অবস্থায় গ্রামে একটি পাঠশালা করিয়াছিলেন, কিন্তু দরিদ্র কৃষকপ্রধান গ্রামে ছাত্রের একান্ত অভাব প্রযুক্তই হউক, অথবা তাঁহার সরস্বতীবিনোদন-শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই হউক, দুই তিন মাসের মধ্যেই পাঠশালাটি উঠিয়া যায়। পরে বহুকাল আট দশ টাকা বেতনে তিনি এক আড়তে কাজ করেন। গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া, দুই তিনটা নদী পার হইয়া, বিদেশে চাকরি করিবার জন্ত তিনিই প্রথমে

বাহির হইয়াছিলেন। গ্রামের লোকের নিকট তিনি দ্বিতীয় ইউলিসিস ছিলেন। তিনি বলিতেন—তিন তিনটা পাশ কারও ভাগ্যে বড় ঘটে না—এ কথা তিনি আড়তদার বাবুর জামাইয়ের মুখে শুনিয়াছেন। জামাই বাবু অনেক কষ্টে একটা পাশ করিয়াছিলেন, এবং আর একটা পাশের আধখানা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। সুতরাং রাধানাথ যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

রাধানাথ বড় বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় মাতুলালয়ে আসে। মাতুলের সন্তানাদি না থাকায় সে আদরে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। মাতুলের অবস্থা ভাল নয়। সামান্য কয়েক বিঘা মাত্র জমির আয়ে কোন প্রকারে ক্ষুদ্র সংসারটি চলে। এ অবস্থায় রাধানাথ যে বি, এ পাশ করিল, তাহা নিঃসন্দেহ তাহার ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহের ফল। কলিকাতায় থাকিয়া, ছেলে পড়াইয়া, নিজের খরচ চালাইয়া, তিনটি পাশ করিতে তাহার অর্দ্ধেক জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়াছিল। আজকাল অর্থোপার্জ্জনের হিসাবে বি এ পাশের মূল্য সে জানিত। এ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য সে প্রথম প্রথম চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। রামধন চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"ওহে ভায়া, আমি বিশ বৎসর পাটের আড়তে কাজ ক'রেছি; ওসব আমার বিলক্ষণ জানা আছে। পাছে আমরা সময় অসময়ে কিছু সাহায্য চাই তাই ও

কথা ব'ল্‌ছ।" রাধানাথ আর কিছু বলিত না—বসিয়া বসিয়া গ্রামবাসীদের কবি-কল্পনার দৌড় দেখিত।

রাধানাথ অনেক দিন হইতে চাকরির চেষ্টা করিতেছিল, বি এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহু স্থানে চাকরির জন্য আবেদন করিয়াছিল। দুই এক স্থলে প্রতিযোগী পরীক্ষায়ও উপস্থিত হইয়াছিল। কোন স্থান হইতেই কোন সংবাদ আসিল না। অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই বাজে বিজ্ঞাপন! লোক গোড়া হইতেই ঠিক থাকে, বিজ্ঞাপন একটা লোক-দেখান ব্যাপার মাত্র। হতাশ হইয়া, কেবলমাত্র বি এ পাশের সংবাদটি সম্বল করিয়া, রাধানাথ বাড়ী ফিরিয়াছিল।

এত দিন পরে হরিগোপালপুর মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির নিকট হইতে উত্তর আসিল, রাধানাথের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। এই পদের বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা, আহার ও বাসা খরচ কিছু লাগিবে না। রাধানাথ প্রথমে ভাবিল, দূরদেশে এত অল্প বেতনে চাকরী করিবে না. কিন্তু অন্য কোন স্থান হইতে আবেদনের উত্তর না আসায়, এবং কলিকাতায় বি, এ পাশের মর্য্যাদা কত, এবং বাসাখরচও কিরূপ অধিক, তাহা বিলক্ষণ বিদিত থাকায়, সে অগত্যা দূরদেশে চাকরি স্বীকার করিল।

লম্বা খামে রাধানাথের নামে পত্র আসিয়াছে দেখিয়া গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই স্থির করিল, লাটসাহেব

রাধানাথকে ডাকিয়াছেন। কল্পনাকুশলা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরাণী বলিলেন, "এবার রাধু বিবি-বউ নিয়ে আসবে।" রাধানাথের মাতুলানী রাত্রে আহারের সময় ভাগিনেয়কে বলিলেন—"বাবা, চাকরি কর, দারোগা হও, কিন্তু বিবি বে ক'রো না। লাটসাহেবকে বুঝিয়ে ব'ল, আমাদের বংশে বিবি বে করতে নিষেধ আছে। আমি ও পাড়ার রায়েদের ছোটমেয়েটিকে বউ করিব স্থির করিয়াছি। মেয়েটি রাঁধতে বাড়তে, কাজকর্ম্মে খুব পটু। বয়স হ'ল, আর কি একলা দুবেলা সমানে কাজ ক'রতে পারি?"

রাধানাথ মাতুলানীর মুখের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, "মামী মা, তুমি কি এত বক্‌ছ?"

মামী বলিলেন, "ঐ যে সই বল্‌ছিল, লাটসাহেবের কাছ থেকে তোমার চিঠি এয়েছে; তোমাকে দারোগা করবে, আর বিবি বে দেবে?"

রাধানাথ এতক্ষণে সমস্ত বুঝিল; কিছু না বলিয়া গম্ভীর-ভাবে আহার করিতে লাগিল। সে কেবল ভাবিতে লাগিল, এই আশা একেবারে নির্ম্মূল হইলে ইহাদের কি কষ্ট হইবে!

রাধানাথকে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, মাতুলানী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তা বাবা, যখন তোমার একান্ত ইচ্ছা, তখন বিবিই বে ক'র। তবে, বৌ আনবার আগে কাহণ পাঁচেক খড় দিয়ে

পশ্চিমের ঘরখানা ছাইয়ে ফেল। বর্ষাকালে ঘরটায় জল পড়ে। কা'ল তোমার মামাকে এ কথা বল্‌ব।"

২

রাধানাথ যথাকালে হরিগোপালপুর যাত্রা করিল। কোথায় কেন যাইতেছে সে তাহার কোন কথাই কাহাকেও বলিল না। যাইবার সময় মাতুল, আশীর্ব্বাদ করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিলেন—"বাবা, তক্তে বসেই আমাকে খবর দিও; গিয়ে দেখে চক্ষু জুড়াব।" মাতুলানী বলিলেন—"বিবি বউ ঘরে আন্‌বার আগে খবর দিও—ঘর নিকিয়ে মুছিয়ে রাখ্‌তে হবে। আর কিছু তেলের মসলা নিয়ে এস; মোড়লদিদি বল্‌ছিল, বিবিরা শুধু তেল মাখ্‌তে পারে না।" মাতুলানী ও গ্রামবাসিনীদিগের বিবি সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ ছিল। 'তিনটা পাশের' ন্যায় 'বিবি' জিনিশটাও তাহাদের নিকট এক অদ্ভুত পদার্থ ছিল। ইহাদের হাত ছাড়াইয়া রাধানাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রথমে হাঁটা—পরে রেল—তার পর ষ্টীমার—পরে গরুর গাড়ী—তদনন্তর পুনশ্চ তিন ক্রোশ পদব্রজ—এইরূপে যাত্রার তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে রাধানাথ হরিগোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি প্রবলপ্রতাপ শ্রীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সদর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। এত দূর জানিলে সে কখনই আসিত না। সমস্ত পথ সে কেবল

ভাবিতেছিল, "যদি বি, এ পাশ করিবার চেষ্টায় বৃথা সময় ও শক্তি ব্যয় না করিয়া কোন কাজ কর্ম্ম শিখিতাম, তাহা হইলে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। আমার সহায় সম্পত্তি নাই ; তেমন মেধা বা প্রতিভা নাই ; এরূপ অবস্থায় আমি ভাগ্যবান্ যুবকগণের অনুকরণে কার্য্য করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। তবে দুঃখীর সংখ্যা আর বাড়াইব না, এ জীবনে কখনও বিবাহ করিব না। কিন্তু গ্রামের লোক বা মাতুল মাতুলানীকে কিরূপে মুখ দেখাইব ? বি, এ পাশ ক'রে পঁচিশ টাকা মাহিনা !"

সেক্রেটারি মহাশয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির গঠনের অসাধারণত্ব তাঁহার এক বিশেষত্ব—কোটি লোকের মাঝে তিনি একটি। রংটাব কৃষ্ণবর্ণ ; বাহু দুইটি বনমানুষের ন্যায় লোমশ ও প্রায় আজানুলম্বিত, তাহাদেব তুলনায় পদযুগল অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। বোধ হয় একদিকে পদগৌরব অত্যন্ত অধিক বলিয়া, অন্যদিকে তাহার হ্রাস হইয়াছে। উদরপ্রদেশ অত্যন্ত স্থূল ; বুক লোমে ঢাকা ; নাকটি ক্ষুদ্র, ললাটের নিম্নপ্রদেশ হইতে উঁচু হইয়া আসিয়া ওষ্ঠের সহিত একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে ; চক্ষু ও মস্তক যার-পর-নাই ক্ষুদ্র ; কর্ণের দীর্ঘত্ব সুদসমেত এই হ্রস্বত্ব পোষাইয়া লইয়াছে। গ্রামের লোক সকালে তাঁহার নাম করিতে বা মুখ দেখিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি ছোট-খাট জমিদার, কিন্তু ছোট-খাট হইলে কি হয়, তিনি প্রজাদের যম। গ্রামে

কাহারও এমন সাহস নাই যে তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করে। স্বার্থ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। গ্রামের ছেলেরা লেখা পড়া শিখে, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে। তবে তিনি যে হরিগোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ, এ কার্য্যে নানা প্রকারে দুই পয়সা আছে।

যখন রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন গ্রামের কয়েকজন মোসাহেবের সহিত তিনি নিজ বিবাহের কথা কহিতেছিলেন। আজ প্রায় ছয় মাস হইল তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল, কালীধন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার সমস্ত জমি বন্ধক রাখিয়া, মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে তিন শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। এই কয় বৎসর শুদ—শুদের শুদ—তস্য শুদে—তাহা হাজারের উপর উঠিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, যদি বিদ্যাভূষণ তাঁহার সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি এই ঋণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় প্রথমে কোন মতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে নানাপ্রকার অত্যাচারের ভয়ে, নিজের, পত্নীর ও পাড়ার লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তাঁহার কন্যা

সুশীলাও রূপে গুণে সকলের প্রিয় ছিল। তাহার এই দুর্ভাগ্যে সকলেই দুঃখিত হইল।

আগন্তুক যুবককে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে হে?"

রাধানাথ বলিল—"আমার নাম শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায়।"

"নিবাস?"

"বীরভূম জেলা, পাষাণীর মাঠ গ্রাম।"

"কি প্রয়োজন?"

"আমি হরিগোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া সেক্রেটারি মহাশয়ের পত্রখানি খোদ সেক্রেটারির হস্তেই প্রদান করিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"আরে তুমি ত ডবকা ছোঁড়া! প্রায় বিপিনের বয়সী, কি বল বোস্‌জা?"

বোস্‌জা বলিলেন,—"আরে তাইত? তোমাকে কি ছেলেরা মান্‌বে?"

রাধানাথ বিনীত ভাবে বলিল, "প্রথম কয়দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"ওহে, আমি লোক দেখেই তার বিদ্যে বুদ্ধি সব বুঝ্‌তে পারি। তা' না হ'লে এ বিষয় সম্পত্তি রক্ষা কর্‌তে পারতাম না। প্রতি বৎসর হরিসভার উৎসব উপলক্ষে অধ্যাপক বিদায় হয়। নিজে বিদায় করি, অধ্যাপকদের চেহারা দেখেই তাদের বিদ্যে

ব'লে দিতে পারি। ও বৎসর দেখ্‌লে ত বোস্‌জা, ছিরাম ন্যায়রত্ন রেগে ব'ল্‌লে, দু' ক্রোশ পথ হেঁটে এসে সবে বার আনা পয়সা বিদায়! কেমন শুন্‌য়ে দিলুম! বেটা রেগে চ'লে গেল, বিদায় নিলে না। ভারি ক্ষতি আমার!" বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বোস্‌জাও হাসিলেন। অধিকন্তু টিপ্পনীস্বরূপ বলিলেন, "বামুন পণ্ডিতগুলো ঘোরতর মূর্খ। নিজের ভাল মন্দ বুঝে না। এই দেখুন না, আমাদের বিদ্যাভূষণ—বলে কি না, আপনার সঙ্গে মেয়ের বে দেবে না! কত জন্ম তপস্যার ফলে এমন সুপাত্র পাওয়া যায় তা' ভেবে দেখেছিস্? মেয়ে যে টাকার গদিতে শুয়ে থাক্‌বে। বয়স? কি এত বয়স আপনার? বলি, গিরিবালা ত আপনার বড় মেয়ে, এখন না হয় তা'র ছেলে পিলে, নাত্তি-নাত্‌নী হ'য়েছে, কিন্তু ওকে যে আমরা হ'তে দেখেছি।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বোস্‌জা, তোমার মত বুদ্ধি সকলের থাক্‌লে কি আর কেউ কষ্ট পায়? ওরে রেমো, বোস্‌জাকে একছড়া কাঁচকলা এনে দেত।" পরে রাধানাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমাকে বাপু পঁচিশ টাকা দিতে পারি না। যদি পনর টাকা মাহিনায় রাজি হও, তাহ'লে থাক। আর আমার বাড়ীতেই অমনি থেতে থাক্‌তে পাবে—কেবল তিনটী ছেলেকে সকাল বিকাল ঘণ্টা চার পাঁচ পড়াতে হবে। এতে রাজি হও থাক, না হয় পথ দেখ।"

ক্রোধে ও ঘৃণায় রাধানাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দেখিল, তিন দিনের পথ আসিয়া আবার ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা কিছু দিনের জন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ভাল। সঙ্গে যে টাকাকড়ি ছিল, তাহাও প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে এ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব। আর কোন্ মুখ লইয়াই বা ফিরিয়া যাইবে? দেশে গেলে, "লাটসাহেব কি বলিলেন", "কত টাকা মাহিনার চাকরি হইল" ইত্যাদি অপ্রীতিকর প্রশ্নাবলীর সে কি উত্তর দিবে? এই সব কারণে দেশে ফিরিতেও তাহার বড় ইচ্ছা ছিল না। জীবনের উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

রাধানাথ সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোস্‌জার দিকে চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন, তিনি কেমন কৌশলে মাষ্টারের দশ টাকা বেতন কমাইলেন। বোস্‌জা ঈষৎ হাস্য সহকারে ঘাড় নাড়িয়া জমিদারবাবুর ইঙ্গিতের সমর্থন করিলেন।

রাধানাথ মনে মনে বলিল—"আর ভগবান্‌কে ডাকিব না। ভগবানের আমি কি করিয়াছিলাম যে, তিনি এই বাইশ তেইশ বৎসর কাল কেবল আমার উপর দুঃখ কষ্টের বোঝা চাপাইতেছেন! এতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে চলিয়াছি। গায়ের রক্ত জল করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছি। তাহার এই পরিণাম! সংসারে আসিয়া লোকের উপকার করা দূরে থাকুক, দরিদ্র মাতুল মাতুলানী আমার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের

দুঃখ পর্য্যন্ত দূর করিতে পারিলাম না। এরূপ ঘৃণিত জীবন দান করিতে ভগবান্‌কে কে বলিয়াছিল? নিষ্ঠুর দেবতাকে আর ডাকিব না।"

৩

কয়েক দিন মাত্র কার্য্য করিয়াই রাধানাথ সম্পূর্ণরূপে বুঝিল, এখানে কোন প্রকারে তাহার সুবিধা হইবে না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে দুইবেলা দুইমুঠা ভাত ও এক অতি জীর্ণ, মূষিকাধ্যুষিত, অন্ধকার ক্ষুদ্র কুঠারীতে থাকিবার স্থান দিয়া, তাহা দ্বারা গৃহশিক্ষক, সরকার ও সময়ে সময়ে গোমস্তার কাজ পর্য্যন্ত করাইয়া লইতে চাহেন। শিষ্ট ব্যবহারের ধার তিনি ধারেন না—যখন যা মুখে আসে তাহাই বলেন। রাধানাথকে খাতায় পঁচিশ টাকা বেতন সহি করিয়া পনর টাকা লইতে হইবে।

তাহার উপর সে দেখিল যে, গ্রামে দুইটি দল হইয়াছে—এক জমিদারের স্বপক্ষ, অন্যদল বিপক্ষ। বিপক্ষদলে শক্তিশালী ও ধনশালী লোক না থাকিলেও, এই দলের সহিতই গ্রামের লোকের সহানুভূতি; তবে জমিদারের ভয়ে এখনও কেহ প্রকাশ্যে ইহাদিগকে সাহায্য করিতে সাহস করে নাই; ইহারাও এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। গ্রামের কয়েকজন যুবক এই দলের নেতা; স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কিশোরীলাল ইহাদের অন্যতম।

রাধানাথ, কিশোরীলাল ও তাহার বন্ধুদিগের সদ্ব্যবহারে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। জমিদারের বিপক্ষদলের সহিত বন্ধুত্বের পরিণাম কি হইবে, তাহাও রাধানাথের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।

কিশোরীলাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া গ্রামের বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া শিক্ষকতা করিতেছে ; সে বারটি টাকা বেতন পায়। তাহার অর্দ্ধেক জমিদারবাবু প্রতিমাসে—অর্থাৎ দেড়মাস কি দুইমাস অন্তর যখন বেতন দেওয়া হয়—কাটিয়া লন , কারণ, কোন্ স্মরণাতীত কালে কিশোরীলালের পিতা কন্যাদায়ে পড়িয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের হিসাবে সে ঋণ বহুকাল পরিশোধিত হইয়াছে। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমস্ত কার্য্যই অমানুষিক। দরিদ্র হইলেও, কিশোরীলালের মন অত্যন্ত বড় ছিল। প্রাণ দিয়াও পরের উপকার করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না। অল্প দিনের মধ্যেই রাধানাথ ও কিশোরীলালের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল।

ক্রমে এক মাস অতীত হইল। রাধানাথ প্রতিদিনই মাহিনার টাকা কয়টি পাইবার আশা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে একদিন শুনিল, আগামী মাসে সেক্রেটারী মহাশয়ের বিবাহ, সুতরাং এ মাসের বেতন এক্ষণে পাওয়া যাইবে না। আর বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের বেতন হইতে টাকায় চারি পয়সা হিসাবে কাটিয়া লওয়া হইবে।

গ্রামের কোন প্রজাও এ দায় হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কিশোরীলালের দল বলিল—"বেটার পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; যে প্রকারে পারি ইহাকে জব্দ করিতে হইবে।"

রাধানাথ এখানে আসিয়া অবধি মাতুলকে কোন পত্র লেখে নাই—কি লিখিবে? মাতুল কিন্তু স্থির করিলেন যে, রাধানাথ পদস্থ হইয়া পূর্ব্বস্নেহ—পূর্ব্ব ঋণ—সমস্ত ভুলিয়াছে। মাতুলানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা আমার বিবি বউ পেয়ে গরীব মামীকে ভুলে গেছে।" পাড়ার লোক বলিল—"ইংরাজী শিখ্‌লে অমনই হয়। সাহেবরা না কি বাপ মাকে ভাত দেয় না।"

৪

স্বভাব-চরিত্র-গুণে রাধানাথ অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সকলের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। গ্রামে প্রায়ই লোকের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণ হইত। দুই একবার সে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটীতেও নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। তাঁহার কন্যা সুশীলাকেও সে দেখিয়াছিল। সে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল—"আহা! এমন মেয়ের অদৃষ্টে এই লেখা ছিল!" ভগবানের বিচারের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিল।

রাধানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে একটি কথা বলি।"

"কি কথা বাবা ? তোমার কথায় রাগ ক'র্ব ?"

"পড়িয়াছি—

'কন্যা কাময়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্ ।

বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥'

তা আপনি কি দেখিয়া সেক্রেটারি মহাশয়ের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতেছেন ? রূপের ত সীমা নাই ; বিত্ত আছে, তাহা লোকের গলায় পা দিয়া উপার্জ্জিত, ছেলেদের মধ্যে ভাগ হইলে চটকস্য মাংস হইবে, আর শুনিয়াছি, সুশীলার মাতাঠাকুরাণী এ বিত্তের আকাঙ্ক্ষা করেন না ; শ্রুতের জাহাজ, কুল কিরূপ জানি না, কিন্তু সৎকুলে এমন কুসাইয়ের জন্ম ত সম্ভব নয় ; আর সকালে যার নাম করিলে অন্ন হয় না, গ্রামের লোকে তাহার বাটীতে মিষ্টান্নের আশা করে বলিয়া মনে করি না।"

বিদ্যাভূষণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কি করিব বাবা, ঋণের দায়ও বটে, প্রাণের দায়ও বটে। আমাকে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা বিলক্ষণ জানি।"

এই কথাগুলিতে তাঁহার এরূপ কাতরতা প্রকাশ পাইল যে, রাধানাথ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

৩

হরিগোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি বৃত্তি প্রার্থনা করিয়া সেক্রেটারি মহাশয় এক আবেদন করিয়া-

ছিলেন। সহকারী ইন্‌স্পেক্টরেরা স্কুলের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বড় ভাল অভিমত দেন নাই। শেষে একদিন স্বয়ং সাহেব দেখিতে আসিলেন। রাধানাথ সমস্ত কথাই সাহেবকে বলিলেন। সাহেব বলিলেন, "এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি দিতে পারেন না।"

রাধানাথ বলিল—"গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি না দিলে স্কুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে, এমন কি হয়ত ইহা উঠিয়া যাইবে। তাহা হইলে এ অঞ্চলের ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। জমিদারের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পাইবে।"

"তবে তুমি কি করিতে বল?"

"আমি বলি, গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি দিন ও নূতন সেক্রেটারি নিযুক্ত করুন।"

"তোমার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

রাধানাথের সহিত কথা বার্ত্তায় সাহেব তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"যুবক, আমার বোধ হইতেছে তুমি এখানে কাজ করিতে ইচ্ছুক নহ।"

"আপনার অনুমান সত্য।"

"তুমি কি করিতে চাও?"

"কোন ভাল চাকরি পাইলে করি।"

সাহেব ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন—"চাকরি! কেন চাকরি ছাড়া কি অর্থ উপার্জ্জনের আর কোন উপায় নাই? চাক-

রিতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না। মহাজনের উক্তি জান ত,—'যেখানে একগাছি তৃণ জন্মে, সেখানে যিনি দুই গাছি তৃণ উৎপাদন করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ।' আর, সকলেই চাকরি খুঁজিলে, চাকরির অবস্থা এইরূপ শোচনীয় না হইয়া কি হইবে?"

রাধানাথ বিনীত ভাবে বলিল—"মহাশয়, সমস্ত বুঝি, কিন্তু আমার মত দরিদ্রের বোধ হয় চাকরি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।"

"কেন? তোমাদের দেশেই ত কথা আছে—বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ হয়, কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক, রাজসেবায় তাহারও অর্দ্ধেক। তোমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। তোমরা কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা কর না কেন? এ দিকে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ আছে।"

রাধানাথ চুপ করিয়া রহিল। সাহেব বলিলেন—"যদি কৃষি শিক্ষা করিয়া উন্নতি করিতে চাও, তাহা হইলে আমাকে লিখিও। এক সাহেব কোম্পানী সুন্দরবনে বিস্তর জমি লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আমি তোমাকে তাঁহাদের নিকট কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারি। কিন্তু বি, এ পাশ করিয়া চাষার কাজ করিতে লজ্জা হইতেছে, নয়?"

সাহেব হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

কিশোরীলাল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন, রাধানাথ বাবু বৃত্তির জন্য সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, সাহেব বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেক্রেটারি সেক্রেটারি ক'রে কি বল্‌লে ?"

"আপনারই সুখ্যাতি হচ্ছিল ।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক গাল হাসিয়া বলিলেন— "অনেক ক'রে স্কুলটিকে বাঁচয়ে রাখা গেছে হে ! আমার কি, গ্রামের লোকেরই উপকার । তবু শালারা কত কথা বলে ।"

৬

রাধানাথ মাঠের ধারে দীঘির পাড়ে বসিয়া সাহেবের কথা ভাবিতেছিল । পূর্ব্বদিন বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । কৃষকেরা আনন্দে মাঠে লাঙ্গল দিতেছে । সূর্য্য অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন ; কিন্তু কৃষকদিগের কাজের তখনও বিরাম নাই । রাধানাথ তাহাদের দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল— "এত লেখা পড়া শিখিয়া শেষে চাষা হইব !"

এমন সময় অদূরে কে গান গাহিল—

"মন রে কৃষি কাজ জান না ।
এমন মানব-জমি রইল পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোনা ॥"

স্থান ও কালের গুণে এবং রাধানাথের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় গীতটি তাহার মর্ম্মস্পর্শী হইল । রাধানাথ যেন এই গীতে কাহার ইঙ্গিত দেখিল । সে বলিয়া উঠিল—"না, কৃষিই শিখিব, পতিত জমী আবাদ করিয়া সোনা ফলাইব ।"

রাধানাথ সেই রাত্রেই সাহেবকে চিঠি লিখিল। অল্প দিনের মধ্যেই উত্তর আসিল—"শীঘ্রই চলিয়া আসিবে।"

রাধানাথ কিশোরীলালকে সাহেবের পত্র দেখাইয়া বলিল—"কিশোরীবাবু, আপনাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম, কিন্তু আমাকে যেন আপনারা না ভুলেন। আমি আপনাদের স্নেহ-ঋণ এ জন্মে ভুলিতে পারিব না।"

কিশোরী বলিল—"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন; কিন্তু আপনাকে ছাড়িতে প্রাণ চাহিতেছে না।" তাহার কণ্ঠস্বরেই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ পাইল।

রাধানাথ বলিল—"আর এক দুঃখ কিশোরী বাবু"—বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

"আপনি কিসের কথা বলিতেছেন?"

"সুশীলার বিবাহ।"

"কি হইয়াছে?"

"অমন বরে অমন মেয়ে!"

"উপায় কি? এমন ত কত হইতেছে।"

রাধানাথ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। কিশোরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৭

বৈশাখ মাস—বিবাহের মাস। গ্রামের জমিদার—স্কুলের সেক্রেটারি—প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ত—হরিসভার সভাপতি—

প্রবলপ্রতাপ গঙ্গাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে কালীধন বিদ্যাভূষণের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এই বিবাহে এক নম্বর বিরোধী—চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা গিরিবালা। সে পিতাকে অনেক বুঝাইল, বলিল—বাবা, বিপিনেরই বিবাহের বয়স হইয়াছে। তারই বে দিয়ে বউ আন। এ বয়সে তোমার বে করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ভাল দেখায় না।

বাপ বলিলেন,—তুই দূর হ—আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না।

দুই নম্বর বিরোধী—জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিন। তাহার বয়স উনিশ কুড়ি বৎসর। সে পিতাকে কিছু বলিতে পারিত না; কিন্তু অন্য লোকের কাছে তাহার অসন্তোষ প্রকাশ করিত।

চট্টোপাধ্যায় বোস্‌জাকে বলিলেন—দেখ্‌লে বোস্‌জা—বেটা বেটীদের আক্কেল! আমি আবার বিয়ে ক'র্‌লে, ছেলে পিলে হ'লে, নিজেদের ভাগে কম পড়্‌বে কি না—তাই প্রতি-বাদ হ'চ্ছে;—কিন্তু আমার দুঃখ কষ্টের কথা কেও ত ভাবেনা। আজকালকার ছেলেপিলেরা এই রকমই। বলি, ভীষ্ম ক'রেছিল কি? আর বিপ্‌নেটা এখনও মাইনর পাশ ক'র্‌তে পার্‌লে না—তার আবার বে কি?

বোস্‌জা বলিলেন—বটেই ত! সংসারে সব বেটা

স্বার্থপর। চাচা আপনি বাঁচা। গৃহিণী নিয়েই ত গৃহ! গৃহিণী না থাক্‌লে ঘর যে শ্মশান।

"বল ত দাদা! তোমার ঋণ, বোস্‌জা, এ জন্মে আর শোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

তিন নম্বর বিরোধী—কিশোরীলালের দল। ইহারা গোপনে স্থির করিল—ঘাটের মড়ার সঙ্গে অমন সুন্দরী, লক্ষ্মী মেয়েটার কোন মতেই বিয়ে দিতে দেওয়া হ'বে না।

বিদ্যাভূষণ-গৃহিণীও ঘোরতর বিরোধী; কিন্তু তিনি কি করিবেন? স্বামী যে কত দুঃখে এ বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহা ত তিনি বুঝেন।

ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইয়াছে, বর বাহির হইবে। বরযাত্রিগণের সমাগম হইয়াছে। বর পাকাচুলে কলপ দিয়া, সিঁথি কাটিয়া, লাল চেলির কাপড় পরিয়া, মাথায় টোপর ও গলায় ফুলের মালা দিয়া, এক অলৌকিক, অদৈবিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বোস্‌জার সহিত রসিকতা করিতেছেন। দ্বারে পাল্‌কী উপস্থিত। বর গজেন্দ্রগমনে হেলিতে দুলিতে আসিয়া পাল্‌কিতে কোনরূপে বরবপুখানি প্রবেশ করাইয়াছেন, এমন সময় কয়েকজন কনষ্টেবল ও চৌকিদার সঙ্গে লইয়া সদর হইতে সব্‌ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারারা পাল্কী তুলিতে যাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন ও এক ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

বলিলেন—"আমি আপনাকে arrest করিলাম, এখনই আপনাকে আমার সহিত সদরে যাইতে হইবে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন—"ভুবলপুরের খুনের সম্বন্ধে আমার ত কোন দোষ নাই। বেটারা মিছামিছি ক'রে ব'লেছে, ইন্‌স্পেক্টর মশাই, যে আমি ঘুষ নিয়ে লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছি। সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে গোপনে অনেক কথা আছে—সে কথা কা'ল হবে, আজ আপনি এখানে থাকুন।"

সবইন্‌স্পেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ঠাকুরঘরে কে ? না, আমি ত কলা খাইনি। আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

চট্টোপাধ্যায় অতীব কাতরস্বরে বলিলেন—"আমার যে আজ বিবাহ, বাবু! আজ ছেড়ে দিন; আপনাকে (কণ্ঠস্বর নামাইয়া ও তর্জ্জনী ও মধ্যমা উত্তোলন করিয়া) পান খেতে দিব।"

"সদরে গিয়ে সে কথা হবে।" বলিয়া সবইন্‌স্পেক্টর মহাশয় বেহারাদিগকে পাল্কী উঠাইতে বলিলেন।

এবার চট্টোপাধ্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"দোহাই ইন্‌স্পেক্টর বাবু,আজিকার দিনটি ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের মনোভঙ্গ ক'র্‌বেন না। আহা গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার—বড় পুণ্য কার্য্য—তাই এ কাজ কচ্ছি—পুণ্যকার্য্যে বাধা দেবেন না।"

পাল্‌কী হইতে বাহির হওয়া তাঁহার পক্ষে যদি সহজসাধ্য হইত, তাহা হইলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া ইন্‌স্পেক্টরের পায়ে ধরিতেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পারিয়া উঠিলেন না।

বেহারারা পাল্‌কী উঠাইল। চট্টোপাধ্যায়—'হায় হায়' করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"যদি একান্তই যেতে হয় ত কালীধন বিদ্যাভূষণের বাড়ী হ'য়ে যান। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিয়েটা হ'য়ে গেলেই নিয়ে যাবেন। প্রথম রাত্রেই বিয়ে।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু উত্তর করিলেন—"সেটা সদরে হবে।"

একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চট্টোপাধ্যায়ের নিতান্ত অনুগত দুই একজন ভিন্ন এই ব্যাপারে সকলকেই খুসী দেখা গেল। হাতী পাঁকে পড়িয়াছে ভাবিয়া কেহ কেহ প্রকাশ্যে আনন্দ করিতে লাগিল।

কিশোরীলাল বলিল—"সকলে কি এইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে? তাহা হইলে সুশীলার বিয়ের কি হ'বে?"

রাধানাথ এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। কিশোরীলালের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং বোধ হয় কতকটা নিজের ইচ্ছায়, সে সুশীলার বিবাহ পর্য্যন্ত হরিগোপালপুরে থাকিতে সম্মত হইয়াছিল। কিশোরীলালের কথা শুনিয়া সে বলিল—"তাইত, হিন্দুর ঘরে মেয়েটির ত আজই বিবাহ দেওয়া চাই।"

কিশোরীলাল বলিল—"সে জন্য ভাবিবেন না। বর ঠিক আছে।"

কথাটা রাধানাথের বড় ভাল লাগিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"এই গ্রামেই তার বাড়ী ?"

কিশোরী বলিল—"এ গ্রামে নয়, ভিন্ন গ্রামে।"

"কি করে ?"

"চাষবাস।"

রাধানাথ অস্ফুটস্বরে বলিল—"চাষাকে এমন মেয়ে দিলে ! এ দেশের লোকগুলো সব সমান।"

বিবাহবাড়ীতে যাইতে তাহার আর ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু কিশোরীলাল তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে জনতা বিবাহবাড়ীতে উপস্থিত হইল। বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় সমস্ত সংবাদ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। কিশোরীলাল বলিল—"কালী খুড়ো, ব'সে যে ?"

বিদ্যাভূষণ উত্তর করিলেন—"সবই ত জান বাবা !"

"জানি বই কি ; পাত্র হাজির।"

"এ পরিহাসের সময় নয়, কিশোরী ! লগ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।"

"তবে আমরা অবিলম্বে বিবাহের আয়োজন করি।" বলিয়া কিশোরী দলবল সহ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ; বিদ্যাভূষণ পূর্ব্ববৎ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

নিমেষের মধ্যে কিশোরীলাল একখানি চেলির কাপড় আনিয়া রাধানাথকে বলিল—"কাপড়খানি পরিয়া ফেলুন।"

রাধানাথ অবাক্! "এ কি কিশোরী বাবু—আমি—আমি—"

"হাঁ, আপনিই সুশীলার বর। অসহায়া বালিকাকে রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করা কি সৎকার্য্য নয়, রাধানাথ বাবু?"

"কিন্তু আমি যে এখন বিবাহ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

কিশোরীলাল হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা' সে দিন আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম।"

রাধানাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিশোরীলাল তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বিবাহস্থানে উপস্থিত হইল। যথারীতি শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

বিদ্যাভূষণ-গৃহিণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি ব'সে ভাব্‌ছ? কন্যাদান ক'র্‌বে এস।"

বিদ্যাভূষণ বিনাবাক্যব্যয়ে যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় পত্নীর অনুগমন করিলেন। বর দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এযে আমাদের মাষ্টার মহাশয়! কিশোরী, বাবা,—বেঁচে থাক, আমি চিরকাল তোমার কেনা হ'য়ে রইলাম।"

কিশোরীলাল বলিল—"ছেলেবেলায় সুশীলা আদর ক'রে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—দাদা, আমায় ভাল বর্‌

চাই। আমি বলিতাম—তাই হ'বে। আজ আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল।—কেমন বল্ হ'য়েছে সুশী?"

সুশীলা লজ্জায় মুখ ঢাকিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ের আনন্দ লুকাইতে পারিল না।

তিন দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়া সদর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই শুনিলেন—হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সুশীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি আপন গৃহমধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথার উপর হত্যার সহায়তা করার অভিযোগ ঝুলিতেছে—সে মোকদ্দমা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বোধ হয় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। ইতিমধ্যেই প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি কাহারও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, বিবাহের দিনই তাঁহাকে সদরে চালান দিবার ষড়যন্ত্র অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। কিন্তু বুঝিয়া এখন কোন ফল নাই। তিনি গদির উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন—"যদি গুরু দিন দেন সব বেটাকে দেখে নেব।"

৮

রাধানাথ আর কালবিলম্ব না করিয়া সাহেব কোম্পানীর আপিসে গেল। তিন বৎসরের মধ্যেই সে কৃষিকার্য্যে বিশেষ

অভিজ্ঞতা লাভ করিল। কোম্পানীর নিয়মানুসারে সে একটি ক্ষুদ্র অংশীদার হইল।

এইবার সে পাষাণীর মাঠের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইল। কোম্পানীর অনুমতি লইয়া এতদিন পরে সে মাতুলালয়ে চলিল। একা নহে—সস্ত্রীক।

রাধানাথের মাতুল মাতুলানী বড়ই মনের কষ্টে কাল কাটাইতেছিলেন। গত দুই বৎসর রাধানাথ প্রতি মাসেই তাঁহাদিগকে টাকা পাঠাইয়াছে, তাঁহাদিগের কুশল সংবাদ লইয়াছে। কিন্তু অতবড় পদ পাইয়াও সে একবার আসিয়া মাতুল মাতুলানীকে সে কথা জানাইয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিল না, বা একবার তাঁহাদিগকে তাহার কাছে লইয়াও গেল না! তাঁহারা কি তাহার টাকারই প্রত্যাশা করেন? সে যে তাঁহাদের জীবন। টাকা না পাঠাইয়া সে একবার দেখা দিয়া গেল না কেন? চক্রবর্ত্তিগৃহিণী বলিলেন—"আস্‌বে কি ক'রে? বিবিরা কি শ্বশুর শাশুড়ী নিয়ে ঘর কর্‌তে চায়? আজকালকার ছেলেদের জান ত, স্ত্রীর কথায় তারা বাপ-মা ছাড়ে, তোমরা ত মামা-মামী! কথায় বলে—

জন জামাই ভাগ্‌না,
তিন নয় আপনা।"

কথাটা মাতুলানীর প্রাণে বড় বাজিল। তিনি বলিলেন—"না না, ও কথা ব'লো না, রাধু আমার আজকালকার ছেলে নয়। যেখানে থাকে সুখে থাক্‌, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

এমন সময় পাড়ার ছেলেরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল—"রাধু দাদা পাল্কী ক'রে বিবি বউ নিয়ে আস্‌ছে!"

দেখিতে দেখিতে দুইখানি পাল্কী মাতুলের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা বিবি বউ দেখিতে আসিল। রাধানাথের মাতুলানী অনেকটা সঙ্কুচিতভাবে পাল্কী হইতে বউ তুলিয়া লইতে আসিলেন। বউয়ের আল্‌তাপরা সুন্দর পা দুখানি দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"তবে যে সই বল্‌ছিল বিবিরা পায়ে আল্‌তা, সীঁথিতে সিঁদুর পরে না!" কিন্তু বউয়ের মুখ দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্! তাঁহাদেরই মত কাপড় গয়না পরা, হাতে নোয়া, মাথায় সিঁদুর, রং যেন দুধে আল্‌তা গোলা। বউ তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। হৃদয়ের আনন্দ আর তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; দুই চক্ষু বহিয়া অজস্রধারায় তাহা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি পুত্র ও বধূকে বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দে অধীর হইয়া বউ কোলে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

* * *

রাত্রে সুশীলা রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি বিবি বে ক'র্‌তে চেয়েছিলে?"

রাধানাথ হাসিয়া বলিল—"আমি চাই নাই—তবে উহারা

সকলে মিলিয়া আমার ঘাড়ে একটি বিবি চাপাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন।"

"তবে ত আমাকে বে করায় তোমাদের বড় আশাভঙ্গ হ'ল?"

রাধানাথ সস্নেহে পত্নীর কপোলে টোকা মারিয়া বলিল—"তা কেন? আমি ত বিবিই বে ক'রেছি। শুন্‌ছনা সকলেই তোমাকে বিবি বউ ব'লছে?"

৯

এবার অহল্যা পাষাণীর উদ্ধারের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

রাধানাথের অক্লান্ত যত্নে ও কোম্পানীর সাহায্যে পাষাণীর মাঠ কয়েক বৎসরের মধ্যে কমলার ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইল। যেখানে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মিত না, সেখানে এখন যথার্থই সোনা ফলিতে লাগিল।

রাধানাথ এখন গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর গুণের কথা লোকে এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে না। তাঁহারই কৃপায় চাষবাসের উন্নতি করিয়া গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে।

রাধানাথের মাতুলালয়ে এখন দোলদুর্গোৎসব হইতেছে। গ্রামে সীতারামের সুন্দর দেউল নির্ম্মিত হইয়াছে। অতিথি-শালা, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামনবমীর দিন আবার মেলা বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃষিপ্রদর্শনী—এই

মেলার একটি প্রধান অঙ্গ। গ্রামের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যারও বৃদ্ধি হইয়াছে।

গ্রামবাসীরা বলে—"শাস্ত্রের কথা কি কখনও মিথ্যা হয়? রামচন্দ্র হরিগোপালপুর হইতে সীতা দেবীকে আনিয়াছেন; রামের সহিত সমুদ্রপারবর্ত্তী ইংরাজ কোম্পানীর মিত্রতা হইয়াছে। ঈশানী আবার তুষ্ট হইয়াছেন। তাই পাষাণীর মাঠের পাষাণ জন্ম ঘুচিয়া গিয়াছে।" তাহারা এখন গ্রামের নাম রাখিয়াছে সীতারামপুর।

রাধানাথের পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হইয়া কিশোরীলাল আসিয়াছে। প্রভাতে বেড়াইতে বেড়াইতে পাষাণীর মাঠের অপূর্ব্ব হরিৎ শোভায় মুগ্ধ হইয়া,কিশোরীলাল বলিল—"রাধানাথ, যথার্থ পাষাণ উদ্ধার করিয়াছ বটে! এখন বল দেখি, সুশীলাকে চাষার হাতে দিয়া কি সত্য সত্যই মূর্খতা করিয়াছিলাম?"

রাধানাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—"তবু ত চাষা বটে!"

কিশোরীলাল বলিল—"কিন্তু এমন চাষায় কবে আমাদের দেশ ভরিয়া যাইবে ভাই?"

রাধানাথ উত্তর করিল—"ভগবানের কাছে দিবানিশি তাহাই আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি"—"সাত পেনি"-সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকলও পূর্ব্ব প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র; বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এইরূপ সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'পল্লী-সমাজের' এত সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চম সংস্করণ, 'অভাগী'র ৪র্থ সংস্করণ এবং বড়বাড়ী, অরক্ষণীয়ার তৃতীয় সংস্করণ ও অনেকগুলিরই ২য় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ অপ্রকাশিতগুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়। যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৵০ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিতগুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক্ পৃথক্ সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ

পল্লী-সমাজ (৫ম সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ

বিবাহ-বিপ্লব (২য় সংস্করণ) শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ

চন্দ্রনাথ (৩য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুলালদল (২য় সংস্করণ) শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

বড়বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

অরক্ষণীয়া (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—(২য় সংস্করণ) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সোণার পদ্ম—(২য় সংস্করণ) শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

আলেয়া—(২য় সংস্করণ) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

বন্ধুদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, বি এল্

স্মৃতির ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রসির ডায়ারী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ

নব-বর্ষের-স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইংরেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই

হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন

কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ,

পল্লীরাণী—শ্রীযোগেনাথ গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা